Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনির্মাণে ইসলাম

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মিনতাজ বেগম

রোলঃ 228020270

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনির্মাণে ইসলাম

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মিনতাজ বেগম

রোলঃ 228020270

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনির্মাণে ইসলাম " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মিনতাজ বেগম, আইডিঃ 228020270 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনির্মাণে ইসলাম " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারাফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

মিনতাজ বেগম

(স্বাক্ষর)

মিনতাজ বেগম

আইডিঃ 228020270

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনির্মাণে ইসলাম

ভূমিকা

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি হলো একই সমাজে বসবাসরত বিভিন্ন সম্প্রদায় বা ধর্মের মানুষের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। ইসলাম সম্প্রীতির ধর্ম। ইসলামে সকল ধর্ম ও ধর্মীয় মতামতকে শ্রদ্ধার চোখে দেখা হয়। কোনো ধর্ম বা ধর্মাবলম্বীকে অবজ্ঞার চোখে দেখা হয় না। সব ধরনের মানুষের সরব উপস্থিতিতে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার একটি কল্যাণমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা বলে ইসলাম। সর্বশেষ নবি মুহাম্মাদ (সা.)-কে জাতি, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানবজাতির কল্যাণের জন্য পাঠানো হয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'আমি তোমাকে বিশ্বজগতের প্রতি রহমত হিসেবে পাঠিয়েছি।'(সুরা আম্বিয়া, আয়াত: ১০৭)

সম্প্রদায় কি

ইংরেজি ভাষার "সম্প্রদায়" শব্দটি এসেছে পুরাতন ফরাসি comuneté (আধুনিক ফরাসি : communauté) থেকে, যা ল্যাটিন communitas "community", "public spirit" (ল্যাটিন communis থেকে , "common") থেকে এসেছে ।সম্প্রদায় বলতে একটি অঞ্চলে সাধারণ জীবনযাপন প্রণালি সম্বলিত জনগোষ্ঠীকে বোঝায়।

সম্প্রদায় হলো নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাসরত এমন একটি জনসমষ্টি যারা কোনো বিশেষ স্বার্থের অংশীদার না হয়ে নিজেদের একটি অভিন্ন জীবনযাত্রার অংশ মনে করে। সম্প্রদায় গড়ে ওঠার ভিত্তি দুটি: যথা- ১. একই অঞ্চলে বসবাস ও ২. সম মানসিকতা সম্পন্ন মানুষ।

সম্প্রীতি কি

পৃথিবীব্যাপী মানুষে-মানুষে অরাজকতা, সাম্প্রদায়িকতা, হানা-হানি, বিবাদ, সংঘাত সহিংসতা বিরাজমান। যার ফলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি পরিভাষাটি একটি বহুল আলোচিত বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এই বিষয়টিকে সংজ্ঞায়িত করা প্রয়োজন। এই পরিভাষাটিতে দু'টি শব্দ বিদ্যমান রয়েছে। এগুলো হলো, সাম্প্রদায়িক যার ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো, Communal এবং সম্প্রীতি যার ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Harmony। অভিধানে সাম্প্রদায়িক শব্দটির অর্থ করা হয়েছে, 'দল গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় সম্পর্কিত, সম্প্রদায়গত ভেদবুদ্ধি বিশিষ্ট'।Oxford dictionary এর বর্ণনা মতে, 'Involving different group of people in a community'। সম্প্রীতি শব্দটির অর্থ হলো 'সদ্ভাব, সৌহার্দ্য, প্রেম, প্রণয়, সন্তোষ'। Harmony শব্দের

অর্থ করা হয়েছে, 'A state of peaceful existence and agreement Longman Dictionary তে উল্লেখ করা হয়েছে, 'When people live or work together without fighting or disagreeing with each other' কিন্তু সম্প্রদায়কে বেশিরভাগ তাত্ত্বিকগণ ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। আর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকেও তাত্ত্বিকগণ ধর্মীয় ঐতিহ্য বলে ধারণা দিতে চান। নন্দ গোপাল মেনন এর মতে, 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি হলো ধর্মীয় ঐতিহ্যের একটি ফলাফল'। আশিষ নন্দীর মতে, 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি কার্যকরী ও সফল হয় কারণ রাষ্ট্রীয় পরিসীমার বাইরে এর অবস্থান এবং এর অধিবাসীরা ধর্মীয় মূল্যবোধ ও অনুশীলন এবং মেলবন্ধনের অনুভূতি দ্বারা সৃষ্ট যা সংকীর্ণ গোত্রীয় পরিধির বাইরে অবস্থান করে'।। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বলতে বিভিন্ন জাতি, দল বা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত মানুষের একই সমাজ বা দেশে একত্রে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করার নীতিকে বুঝায়। এমন সমাজ বা দেশে বিরাজমান বিভিন্ন আদর্শ ও মতবাদের অনুসারী ব্যক্তিদের মধ্যে কোনো প্রকার হিংসা-বিদ্বেষ, সংঘাত-সহিংসতার পরিবর্তে পারস্পরিক ভালোবাসা সাম্য ও সৌহার্দভাব পরিলক্ষিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

মুসলিম ও অমুসলিম সম্প্রদায়

মুসলিম শব্দের আক্ষরিক অর্থ "আত্মসমর্পণকারী" (আরবি: مسلم)। ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী ব্যক্তিরা মুসলিম হিসেবে পরিচিত। তাদের মূল বিশ্বাস হলো:

- আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয় এবং মুহাম্মদ (সা.) তাঁর শেষ নবী।
- কুরআন ইসলামের পবিত্র গ্রন্থ এবং হাদীস নবীর জীবনাদর্শ।
- পাঁচ স্তম্ভ (ঈমান, নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত) অনুসরণ করা।

অমুসলিম বলতে ইসলম ছাড়া অন্য যে কোনো ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিকে বোঝায়। ভারতের প্রেক্ষাপটে প্রধান অমুসলিম গোষ্ঠীগুলো হলো:

❖ হিন্দু: সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়; বৈদিক ধর্ম ও বিভিন্ন দর্শনে বিভক্ত (যেমন বৈষ্ণব, শৈব)।
❖ খ্রিস্টান: ভারতে প্রাচীন সিরিয়ান খ্রিস্টান থেকে আধুনিক প্রোটেস্ট্যান্ট পর্যন্ত বিস্তৃত।
❖ শিখ: গুরু নানকের শিক্ষায় প্রতিষ্ঠিত, মূলত পাঞ্জাবে কেন্দ্রীভূত।
❖ বৌদ্ধ ও জৈন: অহিংসা ও ধ্যানচর্চার উপর জোর দেওয়া হয়।
❖ অন্যান্য: পার্সি, ইহুদি, আদিবাসী ধর্মাবলম্বী ইত্যাদি।

ইসলাম ও সাম্প্রদায়িকতা

ইসলাম শান্তি, মৈত্রী ও সম্প্রীতির ধর্ম। সহনশীলতা, নিরপেক্ষতা ও সহমর্মিতা এর পরম বৈশিষ্ট্য। এখানে সাম্প্রদায়িকতার কোনো স্থান নেই। ‘আল্লাহ এক’ ইসলামের এই মতবাদই ইসলামকে সহিষ্ণু করেছে। মুসলমানরা এ কথা বিশ্বাস করে যে, মানুষ অসম্পূর্ণতা নিয়ে জগতে এসেছে। যারা দেব-দেবীর পূজা-অর্চনা করে তারা বিপথগামী ঠিক; তবু সেই এক খোদারই সৃষ্টি। তাই তারাও মুসলমানদের ভ্রাতৃস্থানীয়। তাদেরকে সৎপথে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব মুসলমানদের। কিন্তু যতদিন তারা স্বেচ্ছায় মুক্তির পথ বেছে না নিবে ততদিন সহজভাবেই তাদেরকে তাদের ইচ্ছের ওপর ছেড়ে দিতে হবে। আল-কোরআনে সে নির্দেশই এসেছে। সুরা বাকারার ২৫৬ নম্বর আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা ইরশাদ করেন, ‘ধর্মে কোনো জবরদস্তি নেই।’ ইসলামের এই শাশ্বত বাণীতে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের জন্য বিবেকের স্বাধীনতা এবং উপাসনার স্বাধীনতা সংরক্ষিত রয়েছে।

ইসলামের নবি মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন অসাম্প্রদায়িক। তিনি কেবল মুসলমানদের স্বার্থ বিবেচনা করতেন না, অমুসলিমদের অধিকারের প্রতিও খেয়াল রাখতেন। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধর্মপালন ও বসবাসের ক্ষেত্রে তিনি যে নিরাপত্তা দিয়েছেন, অন্য কেউ তা আজ পর্যন্ত দিতে পারেননি। নবি করিম (সা.)-এর সময়ে প্রায় সমগ্র আরব উপদ্বীপ ইসলামি রাষ্ট্রের অধীনে চলে এসেছিল। অমুসলিম প্রজাদের সঙ্গে তার সর্বপ্রথম মিত্রতামূলক চুক্তি সম্পাদিত হয় নাজরানের খ্রিষ্টানদের সঙ্গে। খ্রিষ্টানদের সার্বিক নিরাপত্তা বজায় রেখে নবিজি চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন।

চুক্তির বর্ণনায় স্পষ্ট লেখা রয়েছে—‘নাজরান ও তার আশপাশের অধিবাসীদের জীবন, তাদের ধর্ম, তাদের ভূমি, তাদের সম্পদ, তাদের উপস্থিত-অনুপস্থিত লোকজন, তাদের দূতবৃন্দ, তাদের উপাস্য প্রতিমাসমূহ আল্লাহর নিরাপত্তা এবং তার রসুলের হেফাজতে থাকবে। তাদের বর্তমান অবস্থার কোনো পরিবর্তন সাধন করা হবে না। তাদের কোনো অধিকারেও হস্তক্ষেপ করা হবে না। তাদের মূর্তিসমূহ ধ্বংস করা হবে না। তাদের কোনো ধর্মগুরুকে ও সন্ন্যাসীকে তার সাধনা থেকে এবং গির্জার কোনো পরিচালককে তার পদ থেকে অপসারণ করা হবে না। যা কিছু তাদের দখলে রয়েছে, তা সেভাবেই থাকবে। তাদের জাহেলিয়াত যুগের কোনো অপরাধ বা খুনের বদলা নেওয়া হবে না। তাদেরকে কোনো সামরিক দায়িত্ব পালন করতে হবে না। ইসলামি ফৌজ তাদের জনপদকে পদদলিত করবে না। তাদের কেউ নিজের কোনো অধিকার দাবি করলে তার সঙ্গে সুবিচার করা হবে। তাদেরকে অত্যাচার করার সুযোগ দেওয়া হবে না এবং তাদের ওপর কোনো অত্যাচার করা হবে না। যে ব্যক্তি তাদের থেকে সুদ গ্রহণ করবে, সে আমার জিম্মা থেকে মুক্ত। চুক্তিপত্রে যা কিছু লিপিবদ্ধ হয়েছে, তা যথাযথভাবে পালনের ব্যাপারে সর্বদা আল্লাহর নিরাপত্তা ও মুহম্মদ (সা.)-এর জিম্মাদারি বহাল থাকবে—যতদিন না এই ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে অন্য কোনো নির্দেশ আসে। তারা যতদিন মুসলমানদের শুভাকাঙ্ক্ষী হয়ে থাকবে, তাদের সঙ্গে চুক্তির যেসব ধারা সংযুক্ত হয়েছে, তা পালন করা হবে।’

নবিজির এই চুক্তি বিশ্ববাসীর জন্য দৃষ্টান্ত হলো যে, ইসলাম বিধর্মীদের প্রতি অসহিষ্ণু আচরণ করবে না এবং তাদের অধিকার খর্ব করবে না। নবিজির পর খোলাফায়ে রাশেদিন এ নীতি পুরোপুরি মেনে চলেছে। জেরুজালেম শহর হজরত উমর (রা.)-এর হস্তগত হওয়ার পর সেখানকার গির্জায় তিনি নামাজ পড়েননি এই আশঙ্কায় যে, ভবিষ্যতে কেউ এসে তার নামাজের বরাত দিয়ে এটিকে মসজিদ বানিয়ে ফেলতে পারে।

ইসলাম সব দিক দিয়ে সংখ্যালঘুদের অধিকার নিশ্চিত করেছে। তাদের প্রাণকে মুসলমানদের প্রাণের সমান সম্মান দিয়েছে। ইমাম বায়হাকি বলেন, 'নবি করিম (সা.)-এর সময় একজন মুসলমান জনৈক আহলে কিতাবিকে হত্যা করেছিল। নবিজির নিকট মুকাদ্দমা পেশ করা হলে, তিনি বললেন, আমার ওপর জিম্মির অঙ্গীকার পালন করার অধিক জিম্মাদারি এসেছে। এই বলে তিনি ওই মুসলিমের প্রাণদণ্ড কার্যকরের নির্দেশ দেন। (বায়হাকি ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০)। খোলাফায়ে রাশেদিনের মধ্যে হজরত

আলি (রা.) ছিলেন ইসলামি আইনের সর্বোচ্চ জ্ঞানী ও নির্ভুল ফায়সালাকারী। তিনি সংখ্যালঘুদের অধিকার সম্পর্কে খুব সচেতন ছিলেন। একবার তার কাছে এক জিম্মির মুকদ্দমা পেশ করা হয়। হত্যাকারী ছিল একজন মুসলিম। সাক্ষ্য প্রমাণে তার অপরাধ প্রমাণিত হলে তিনি হত্যাকারীর মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেন। রায়ের পর নিহতের ভাই এসে বলল, 'হে আমিরুল মু'মিনীন! আমি হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দিয়েছি। হজরত আলি (রা.) বললেন, মনে হচ্ছে, লোকেরা তোমাকে ভীতি প্রদর্শন করেছে। ঐ ব্যক্তি বলল, না, এমন কিছু ঘটেনি। তবে ভাই যেহেতু আর ফিরে পাব না! তা-ই ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে তারা আমাকে রাজি করে নিয়েছে।এরপর হজরত আলি (রা.) বললেন, 'তুমি জানো আর তোমার কর্ম জানে। তবে মনে রেখো, ঐ জিম্মির দায়িত্ব আমাদের ওপর বর্তাবে। তার রক্ত আমাদের রক্তের সমান এবং তার রক্তপণ আমাদের রক্তপণের সমান। সংখ্যালঘুদের জীবনের নিরাপত্তার মতো তাদের ধনসম্পদ রক্ষার ক্ষেত্রেও ইসলাম জোর তাগিদ দিয়েছে। তাদের সম্পদের ওপর কোনো হস্তক্ষেপ ইসলাম সমর্থন করে না। হজরত উমর (রা.) সর্বদা প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও সামরিক আমলাদের এ বিষয়ে নির্দেশ দিতেন। একবার এক ব্যক্তি টাইগ্রিস নদীর তীরে ঘোড়া লালন-পালনের জন্য উমর (রা.)-এর কাছে একখণ্ড জমি চাইল। তিনি বসরার গভর্নর আবু মুসা আশআরিকে লিখে পাঠালেন, 'যদি ঐ জমি জিম্মিদের সম্পত্তি না হয়ে থাকে এবং সেখান দিয়ে কূপের পানি যাতায়াত না করে, তাহলে ঐ জমি প্রার্থীকে দিয়ে দেওয়া হোক।' (ফতহুল বুলদান)। এভাবে আমরা সংখ্যালঘু অমুসলিমদের সঙ্গে সম্প্রীতি বজায় রাখার ও তাদের সার্বিক নিরাপত্তা দেওয়ার ক্ষেত্রে ইসলামের অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেখতে পাই।

অন্তঃমুসলিম সম্প্রদায়

অন্তঃমুসলিম সম্প্রদায় বলতে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বিদ্যমান বিভিন্ন উপদল, মাজহাব (ধর্মীয় মতবাদ), সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক মতাদর্শগত বিভাগকে বোঝায়। যদিও সব মুসলিমই কুরআন ও হাদীসকে ভিত্তি মানে, তবুও ব্যাখ্যা, রীতিনীতি ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে তাদের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়।

ক. প্রধান অন্তঃমুসলিম বিভাজনঃ

❖ **ধর্মীয় মতবাদ অনুযায়ী**

➢ সুন্নি মুসলিম (৮৫-৯০%)
মূল বিশ্বাস: নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর সুন্নাহ (পদ্ধতি) অনুসরণ করে।

➢ শিয়া মুসলিম (১০-১৫%)
মূল বিশ্বাস: নবীর দৌহিত্র ইমাম আলী ও তাঁর বংশধরদের (আহলে বাইত) নেতৃত্ব মানে।

▪ উপশাখা:

✓ ইসনা আশারিয়া (১২ ইমামী): ইরান, ইরাক, লেবাননে প্রধান।

✓ ইসমাইলি: আগা খানের অনুসারী (ভারতে বোহরা, খোজা)

✓ খারিজি: (অতি ক্ষুদ্র সংখ্যা)
ওমান ও উত্তর আফ্রিকায় কিছু অনুসারী।

➢ আহলে হাদীস / সালাফি
মূল নীতি: সরাসরি কুরআন-হাদীস অনুসরণ, মাজহাব মানে না।

➢ সুফিবাদ (আধ্যাত্মিক ইসলাম)
মূল দর্শন: আল্লাহ্র প্রেম ও আত্মশুদ্ধির উপর জোর।

❖ **তরিকা অনুযায়ী**

➢ চিশতিয়া, কাদেরিয়া, নকশবন্দি ইত্যাদি।
ভারতে প্রভাব: আজমীর শরীফ, নিজামুদ্দিন আউলিয়া দরগাহ।

❖ **চার প্রধান মাজহাব অনুযায়ী**

➢ হানাফি, মালিকি, শাফিঈ, হাম্বলি (ফিকহ বা আইনশাস্ত্র ভিত্তিক)।

❖ **জাতিগত ও সাংস্কৃতিক বিভাজন**

➢ আশরাফ vs. অতরাফ (ভারতীয় উপমহাদেশ)

- ✓ আশরাফ: বিদেশি বংশোদ্ভূত (সৈয়দ, শেখ, মুগল, পাঠান)।
- ✓ অতরাফ: স্থানীয় ধর্মান্তরিত মুসলিম (জুলাহা, আনসারি, কুনজরা)।

❖ **ভাষাগত বিভাজন**

- ➢ উর্দুভাষী: উত্তর ভারত, পাকিস্তান।
- ➢ বাংলাভাষী: বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ।
- ➢ মালায়ালম/তামিল: কেরালা, তামিলনাড়ু।

অমুসলিমদের সঙ্গে সম্পর্কের মূলনীতি

ইসলাম তার অনুসারীদের অমুসলিমদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সহনশীলতা ও উদারতার ওপর গুরুত্বারোপ করে। ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে, প্রতিটি মানুষই তার মানবিক মর্যাদার কারণে সম্মানিত, সে যে ধর্মেরই অনুসারী হোক না কেন এবং তার গায়ের রং বা জাতি যাই হোক না কেন।

ইসলামের মতে, এই পৃথিবী মানব জাতির জন্য এক পরীক্ষার ক্ষেত্র। আল্লাহ প্রতিটি মানুষকে সঠিক পথ গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার স্বাধীনতা দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, আমরা তাকে সঠিক পথ দেখিয়ে দিয়েছি, এখন সে কৃতজ্ঞ হবে বা অকৃতজ্ঞ।' (সুরা আদ-দাহর, আয়াত : ৩)

মানুষের মুসলিম বা অমুসলিম হওয়া আল্লাহর এক বিশেষ হিকমত। তিনি ইচ্ছা করলে পৃথিবীর সব মানুষকে মুসলিম বানিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু তার ইচ্ছা ও প্রজ্ঞা হলো, প্রত্যেককে তার নিজের পছন্দমতো ধর্ম অনুসরণ করার অধিকার দেওয়া। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আপনার রব চাইলে সমস্ত মানুষকে একই পথের অনুসারী বানিয়ে দিতেন কিন্তু (কাউকে জোরপূর্বক কোনও দীন মানতে বাধ্য করাটা তাঁর হিকমতের পরিপন্থী। তাই তাদেরকে তাদের ইচ্ছাক্রমে যেকোনোও পথ অবলম্বনের সুযোগ দেওয়া হয়েছে, তারা বিভিন্ন পথেই চলতে থাকবে।)' (সুরা হুদ, আয়াত : ১১৮)

যেহেতু কারও মুসলিম বা অমুসলিম হওয়া আল্লাহর ইচ্ছার অংশ, তাই ইসলাম জোরপূর্বক কাউকে মুসলিম বানানোর অনুমতি দেয় না। আল্লাহ তাআলা বলেন, আপনার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে পৃথিবীর সব মানুষ ঈমান আনত। তবে আপনি কি মানুষকে বাধ্য করবেন যেন তারা ঈমান নিয়ে আসে?' (সুরা ইউনুস, আয়াত-৯৯)

ইসলাম সকল মানুষের প্রতি ন্যায়পরায়ণতা ও সদাচরণের নির্দেশ দেয়। এটি এমন একটি ধর্ম যা তার অনুসারীদের, তা সে মুসলিম বা অমুসলিমের সঙ্গেই হোক, কখনোই অন্যায় বা অবিচার করতে নিষেধ করে। ইসলামে জুলুম ও অধিকার হরণের কোনো স্থান নেই। এ প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, মজলুম-নিপীড়িত

ব্যক্তির দোয়া সে যদি কাফেরও হয়, তার ও আল্লাহর মধ্যে কোনো পর্দা থাকে না। (মুসনাদে আহমদ, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৪১১, হাদিস : ২৩৫৩৬)

অমুসলিমদের সঙ্গে সম্পর্কের প্রকারভেদ:

অমুসলিমদের সঙ্গে সম্পর্কের প্রকারভেদ নিয়ে আলাপ করতে গিয়ে ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞরা সম্পর্কের তিনটি শ্রেণি বর্ণনা করেছেন :

১. মুওয়ালাত

মুওয়ালাত বলতে অন্তরের গভীর ভালোবাসা ও হূদয়ের সখ্যতাকে বোঝানো হয়। এটি শুধুমাত্র মুসলমানদের মধ্যে বৈধ এবং সহ-ধর্মীদের সঙ্গে সীমাবদ্ধ। কাফের ও মুশরিকদের সঙ্গে গোপনীয় সম্পর্ক স্থাপন করা, তাদের প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা রাখা বা এমন কোনো সম্মান প্রদর্শন করা, যা কুফর ও শিরকের প্রতি শ্রদ্ধার সমতুল্য হয়, এটি ইসলামি দৃষ্টিকোণে বৈধ নয়। (আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যাহ, খণ্ড ১৩, পৃষ্ঠা ১৯৫)

কোরআনের বহু আয়াত এবং রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর হাদিসে কুফর ও শিরক গ্রহণকারীদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব বা আপস করার বিরুদ্ধে কঠোরভাবে সতর্ক করা হয়েছে। এগুলো মূলত মুওয়ালাত সম্পর্কিত নির্দেশ। (তাফসিরে রাজি, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ১৪)

২. মুওয়াসাত

মুওয়াসাত অর্থ সহানুভূতি, কল্যাণকামিতা এবং উপকার সাধন। এমন অমুসলিম যারা মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে না বা শত্রুতায় লিপ্ত নয়, তারা সহানুভূতি ও কল্যাণকামিতার যোগ্য। তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা, দুঃখ-কষ্টে সহানুভূতি প্রদর্শন করা এবং তাদের কল্যাণ কামনা করা বৈধ। এর ফলে অমুসলিমরা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং মুসলমানদের সদ্ব্যবহার ও সুন্দর আচরণ দেখে মুগ্ধ হবে। এতে পারস্পরিক দূরত্ব কমবে এবং সৌহার্দ্য বৃদ্ধি পাবে। (বয়ানুল কুরআন, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২০৪)

৩. মুদারাত

মুদারাত বলতে সদাচরণ ও নম্র ব্যবহারকে বোঝানো হয়। এটি সব ধরনের অমুসলিমের সঙ্গে বৈধ। বিশেষত, যখন এর উদ্দেশ্য হয় ধর্মীয় কল্যাণ সাধন, ইসলামের দাওয়াত পৌছানো, বা ইসলামের নৈতিকতার পরিচয় দেওয়া। এছাড়া যদি তারা অতিথি হয়, তবে অতিথির সম্মান জানানো প্রত্যেকের কর্তব্য। আবার কখনো কখনো এর উদ্দেশ্য তাদের ক্ষতি বা দুশ্চরিত্র থেকে নিরাপদ থাকা হতে পারে। (আল-জামে লি আহকামিল কোরআন, খণ্ড ১২, পৃষ্ঠা ৪৩৫)

কোরআনের বিভিন্ন আয়াত, রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর হাদিস, এবং সাহাবায়ে কিরামের জীবন থেকে প্রমাণিত হয় যে একজন মানুষ, সে অমুসলিম হলেও, তার কিছু মৌলিক মানবিক অধিকার রয়েছে। যেমন: জীবনযাপনের অধিকার, অর্থনৈতিক সংগ্রামের অধিকার, সম্পদ ও সম্পত্তির মালিকানা এবং তা ব্যবহার করার অধিকার ইত্যাদি। ইসলাম তাদের জীবন, সম্পদ এবং মর্যাদার সুরক্ষার শিক্ষা দেয় এবং মানবতার প্রতি এই মৌলিক অধিকারগুলোকে সম্মান করার নির্দেশনা দেয়।

অমুসলিমদের সঙ্গে সহাবস্থান

যে মুসলিম অধ্যুষিত রাষ্ট্রে অমুসলিমরাও বসবাস করে, যে মুসলিম রাষ্ট্র মুসলিম-অমুসলিম সবাইকে দেশের নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দেয় এবং সবার অধিকার নিশ্চিত করে— সেই রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিককে কুরআন-সুন্নাহর ভাষায় যিম্মী, মুসতামান-সহ বিভিন্ন নামে নামকরণ করা হয়। এই ধরনের অমুসলিমদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারীমে বলেছেন, দীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে স্বদেশ থেকে বহিষ্কার করেনি, তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না। আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদের ভালোবাসেন।[সূরা মুমতাহিনা, আয়াত ৮]

এই আয়াত থেকে বোঝা গেল, ইসলাম মুসলিমদেরকে অমুসলিমের সাথে সুন্দর, সদয় ও সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ করতে নির্দেশ দেয়। এমনকি পশুপাখি, পোকা-মাকড় ইত্যাদির অধিকারও নিশ্চিত করার নির্দেশ দেয়। রাসূল (সা.) একবার পুড়িয়ে দেওয়া একটা পিঁপড়ার টিবি দেখতে পেয়ে বললেন, 'কে এগুলো পুড়িয়েছে?' সাহাবা কিরাম বললেন, 'আমরা পুড়িয়েছি।' তখন তিনি বললেন, আগুনের রব ব্যতীত আগুন দিয়ে কিছুকে শাস্তি দেওয়া কারো জন্য সমীচীন নয়।[সুনান আবু দাউদ, হাদীস ২৬৭৫)

এজন্যই আমাদের নবী রাহমাতুল লিল-আলামীন—সমগ্র বিশ্বজগতের জন্য রহমত। তিনি মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকল মানবজাতির এবং অন্য সমগ্র সৃষ্টিজগতের জন্য দয়া ও অনুকম্পা হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন।

মহানবী (সা:) যেভাবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করেছেন

শান্তি-সৌহার্দ্য ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সুরক্ষায় ইসলামের রয়েছে শাশ্বত আদর্শ ও সুমহান ঐতিহ্য। অমুসলিমদের প্রতিও কোনো অন্যায় আচরণ ইসলাম অনুমোদন করে না। ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে মহানবী (সা.)-এর প্রতিটি আচরণ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বিরল ও প্রোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এক অমুসলিম বৃদ্ধার ঘটনা ইতিহাসে আমরা জেনেছি। বৃদ্ধা প্রতিদিন মহানবী (স.)-এর চলার পথে কাঁটা দিত। একদিন রাসুল (সা.) দেখলেন, পথে কাঁটা নেই, তখন তিনি ভাবলেন হয়তো ওই বৃদ্ধা অসুস্থ হয়েছে বা কোনো বিপদে আছে, তার খোঁজ নেওয়া দরকার। এরপর মহানবী (সা.) বৃদ্ধার বাড়িতে গিয়ে দেখেন, ঠিকই অসুস্থ। তিনি বৃদ্ধাকে বললেন, আমি আপনাকে দেখতে এসেছি। এতে বৃদ্ধা অভিভূত হয়ে গেল যে, আমি যাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য পথে কাঁটা পুঁথে রাখতাম, সেই আজ আমার বিপদে পাশে দাঁড়িয়েছে। আপনিই তো সত্যিকার অর্থে শান্তি ও মানবতার অগ্রদূত। (শাশ্বত নবী (সা.), পৃষ্ঠা ৬০)

মহানবি (সা.) সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। হাজরে আসওয়াদ স্থাপন নিয়ে মক্কার গোত্রগুলোর মধ্যে যে বিশৃঙ্খলা ও যুদ্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল তা নিরসনে মুহাম্মদ (সা.) বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন। সীরাতে ইবন হিশামে বর্ণিত আছে যে, "ঐ সময় সমগ্র কুরাইশ সম্প্রদায়ের প্রবীণতম ব্যক্তি আবু উমাইয়া ইবনুল মুগীরা নিম্নরূপ আহবান জানালেন, 'হে কুরাইশগণ, এই পবিত্র মসজিদের দরজা দিয়ে যে ব্যক্তি প্রথম প্রবেশ করবে, তাকেই তোমরা এই বিবাদের মীমাংসার দায়িত্ব দাও'। সবাই এই প্রস্তাবে সম্মত হলো। অতঃপর দেখা গেল, মুহাম্মদ (সা.) সর্বপ্রথম প্রবেশ করলেন। তাঁকে দেখে সবাই একবাক্যে বলে উঠলো, 'এতো আমাদের আল আমীন (পরম বিশ্বস্ত) মুহাম্মদ। তাঁর ফয়সালা আমরা মাথা পেতে নেব।' রাসূলুল্লাহ (সা.) বিবদমান লোকদের কাছাকাছি গিয়ে উপনীত হলে সবাই তাঁকে তাঁদের বিবাদের বিষয়টা জানালো। তিনি বলেন, 'আমাকে একখানা কাপড় দাও'। কাপড় দেয়া হলে তিনি তা বিছিয়ে হাজরে আসওয়াদ উক্ত কাপড়ের মধ্যস্থলে স্থাপন করে বললেন, প্রত্যেক গোত্রকে এই কাপড়ের চারপাশ ধরতে হবে"। সবাই তা ধরলো ও উচু করে যথাস্থানে নিয়ে রাখলো। অতঃপর তিনি নিজ হাতে হাজরে আসওয়াদ তুলে যথাস্থানে রাখলেন ও তাঁর উপর গাঁথুনি দি ৩৩ গোত্রীয় সংহতি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অনন্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় এর জীবন আদর্শ থেকে। ফিজার যুদ্ধের অবসানের পর এবং হাশি মুত্তালিবের মৃত্যুর ফলে তাদের গোত্রীয় সংহতি একেবারে ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়েছিল। এই পরিস্থিতিতে আরবের অন্যান্য গোত্র মক্কা অধিকারের স্বপ্ন দেখছিল। অথচ এর আগে আরবের অন্য কোনো গোত্র কূট উদ্দেশ্য নিয়ে মক্কার দিকে চোখ তুলে তাকাবারও দুঃসাহস করত না। কুরাইশদের মধ্যে এই অনুভূতি জাগার পর তারা গোত্রীয় অনৈক্য দূর করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। সে উদ্যোগেরই ফসল হলো 'হিলফুল ফযুল' তথা 'শান্তি সংঘ' নামক সংগঠনটি। আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র যুবায়রের প্রচেষ্টায় একদিন কুরাইশরা সবাই একত্রিত হয়। এই সমাবেশে কুরাইশের বনু হাশিম, বনু যুহরা ও বনু তায়মের সবকটি শাখা উপস্থিত হয়। তাদেরই মধ্যমণি ছিলেন যুবক মুহাম্মদ (সা.)। সবাই এক বাক্যে শপথ গ্রহণ করেন যে, ক. কোনো নিপীড়িতের অধিকার আদায় না হওয়া পর্যন্ত আমরা তার পাশে দাঁড়াব, খ. তাকে সকল প্রকার সাহায্য সহযোগিতা করে যাব। উপস্থিত সবাই মহান স্রষ্টার নাম নিয়ে এই শপথ গ্রহণ করে। (হিলফুল ফযূল) একটি বিখ্যাত অঙ্গীকার ছিল কারণ এর আলোচনা ও প্রভাব রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পরবর্তীতে বিদ্যমান ছিল।

মহানবি (সা.) মদিনা মুনাওয়ারায় হিজরত করার পর সেখানে আনসার, মুহাজির, ইয়াহুদি, নাসারাসহ বিভিন্ন গোত্রপ্রধানদের সমন্বয়ে সকলের গ্রহণযোগ্য একটি সনদ রচনা করেন। যে সনদ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অনন্য নজির হয়ে আছে। এই সনদই বিখ্যাত মদিনার সনদ (The Charter of Medina)। ঐতিহাসিকগণ এই সনদকে বিশ্বের সর্বপ্রথম লিখিত সনদ হিসেবে স্বীকার করেন। ৩৪ এতে ৪৭টির অধিক ধারা সন্নিবেশিত হয়েছে। ধর্ম-বর্ণ-দল মত নির্বিশেষে মানুষের মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মহানবি (সা.) প্রণীত উক্ত সনদ পৃথিবীর ইতিহাসে অবিস্মরণীয় অধ্যায়ের সংযোজন করে। মদিনা সনদের কয়েকটি ধারা নিম্নরূপ:

১.মদিনাবাসী সকলের সম্মিলিত একটি উম্মাহ (জাতি)।

২. মদিনা উপত্যাকা উন্মুক্ত ও সকলের জন্য পবিত্র।

৩. ইয়াহুদি নাসারাগণ শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলে মদিনা রাষ্ট্র তাদের রক্ষা করবে।

৪. তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য বাধ্য করা হবে না।

৫. তাদের সকল প্রকার নিরাপত্তা দেয়া হবে।

৬. তাদের ব্যবসায়-বাণিজ্য, সম্পত্তি ও সর্বপ্রকার অধিকারের নিরাপত্তা থাকবে।

৭. তাদের ধর্ম পালনে কোনো বাধা দেয়া হবে না।

৮. বিচার ব্যবস্থায় তাদের ইনসাফ পাওয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে।

উল্লিখিত ধারাগুলোতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, কিভাবে কাফির-মুশরিক, ইয়াহুদি-নাসারাদের প্রতি নিরপেক্ষ ও উদার মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। মহানবি (সা.) সকল ধর্মের মানুষের অধিকার রক্ষায় শুধু সনদ প্রণয়ন করেই ক্ষ্যান্ত হননি বরং তা নিজের জীবনে সর্বপ্রথম বাস্তবায়ন করে তারপর অপরকে আদেশ দিয়েছেন।

প্রথমত, শতধা বিভক্ত মদিনাবাদীদের গৃহযুদ্ধ বন্ধ করে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা, দ্বিতীয়ত, জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নির্বিশেষে সব মুসলমান ও ইহুদি নাগরিকদের সমান অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারণ করা। তৃতীয়ত, স্বদেশত্যাগী মোহাজেরীনদের মদীনায় বাসস্থান ও জীবিকা উপার্জনের ব্যবস্থা করা। চতুর্থত, মুসলমান ও অমুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রী, সদ্ভাব ও পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে বন্ধুত্ব ও প্রীতিময় সম্পর্ক গড়ে তোলা। পঞ্চমত, মদিনায় ইসলামের ধর্মীয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করে সার্বজনীন ধর্মপ্রচারের ব্যবস্থা করা।

মহানবি (সা.) বিজয়ীবেশে মক্কায় প্রবেশের পর যে সকল কাফির-মুশরিকগণ তাঁকে ইতিপূর্বে শারীরিক যন্ত্রণা দিয়েছিল এবং তাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল, তিনি ধারালো তরবারী দিয়ে মস্তক দ্বিখণ্ডিত করতে পারতেন কিন্তু তিনি অচিন্তনীয় অভূতপূর্ব মহান ও সাধারণ ক্ষমার মাধ্যমে শত্রুদের মন জয় করে নেন। তিনি এই বলে ক্ষমা ঘোষণা করেন: 'আজ তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই। তোমরা মুক্ত ও স্বাধীন।' নিম্নোক্ত ঘোষণা দেয়া হয়:

১. যে ব্যক্তি অস্ত্র ত্যাগ করবে তাকে অভয় দেয়া হবে।

২. যে ব্যক্তি পবিত্র কা'বায় প্রবেশ করবে সে নিরাপদ থাকবে।

৩. যারা নিজেদের গৃহের দরজা বন্ধ রাখবে সে নিরাপদ থাকবে।

৪. যারা আবু সুফিয়ানের গৃহে প্রবেশ করবে তারা নিরাপত্তা লাভ করবে।

সারা জীবন যারা রাসূল (সা.)-এর শত্রুতায় নিমগ্ন ছিলো তাদেরকে তিনি যেভাবে ক্ষমা করার ঘোষণা দিলেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁর মাধ্যমে ইসলামের মহত্ত্ব ও শান্তি প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। সারা জীবন যার শত্রুতায় মহানবি (সা.) ক্ষতবিক্ষত সেই আবু সুফিয়ানের ঘরকে নিরাপদ আশ্রয় প্রদান করার নজির পৃথিবীতে স্থাপন করেছেন। আল কুরআনে এসেছে, 'আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্যে রহমত স্বরূপই প্রেরণ করেছি'।

বিদায় হজ্জের ভাষণে মহানবি (সা.) পৃথিবীর সকল মানুষের প্রতি আহবান জানালেন। এক পিতা-মাতার সন্তান হিসাবে সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতাকে ধূলিস্যাৎ করতে হবে। তিনি এই ভাষণে সমস্ত জাতিভেদ ও অসাম্যের মাথায় কুঠারাঘাত করলেন। আবু নাদরাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে আইয়ামে তাশরিকের মধ্যবর্তী সময়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর ভাষণ শুনেছে সে আমাকে খবর দিয়েছে, তিনি বলেছেন, "হে মানবজাতি, নিশ্চয়ই তোমাদের গ্রন্থ এক। তোমাদের পিতা এক। সাবধান! অনারবের উপর আরবের কিংবা আরবের উপর অনারবের, কালো মানুষের উপর লাল মানুষের কিংবা লাল মানুষের উপর কালো মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব নেই। যার মধ্যে আল্লাহভীতি আছে সেই শ্রেষ্ঠ। বিদায় হজ্জের ভাষণে নবি (সা.) বলেন,

১. সকলে শ্রবণ করুন। জাহিলি যুগের সমস্ত অহংকার তা অর্থগত হোক বা রক্তপাত সবই আমার পদযুগলের তলে দলিত-মথিত ও চিরদিনের জন্য রহিত হয়ে গেল। অর্থাৎ ইসলাম পূর্ব অজ্ঞতা যুগের মিথ্যা প্রতিশোধ গ্রহণ, হীন অথবা প্রথা তাদের কলহ-কোন্দল ও গৃহযুদ্ধকে চিরস্থায়ী ও ক্রমবর্ধনশীল করেছিল, তা আজ নিঃশেষ হয়ে গেল। আজ হতে সকলের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হলো।

২. অতঃপর কেউ কাউকে ইচ্ছাপূর্বক হত্যা করলে এটি তার ব্যক্তিগত অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হবে। তার জন্য গোটা গোত্র দায়ী হবে না।

৩. হে কুরাইশ জাতি! মূর্খতা যুগের অহমিকা ও গর্ব মহান আল্লাহ তোমাদের হতে দূর করে দিয়েছেন। সব মানুষ আদম হতে আর আদম মাটি হতে সৃষ্টি হয়েছেন।

৪. যদি কোনো ক্রীতদাসকে তোমাদের আমির (নেতা) নিযুক্ত করা হয় আর তিনি আল্লাহর কিতাব অনুসারে তোমাদেরকে পরিচালিত করেন, তবে তোমরা সর্বোতভাবে তাঁর আনুগত্য করবে, তাঁর আদেশ মান্য করবে।

৫. স্মরণ রেখো, তোমাদের সকলকে আল্লাহর সান্নিধ্যে উপস্থিত হতে হবে এবং তার নিকট সবকিছুর জন্য জবাবদিহি করতে হবে। সাবধান। আমার পরে তোমরা পথভ্রষ্ঠ হয়ে যেও না এবং পরস্পরের রক্তপাত করো না।

৬. তোমাদের দাস-দাসীদের উপর নির্যাতন করো না, তাদের মনে কষ্ট দিও না। তোমরা যা পরিধান করবে তাদেরকেও তাই পরিধান করাবে।

৭. শিশুরা অসহায় অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে। এ সময় পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, সমাজ ও রাষ্ট্র তাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করবে। প্রাক-ইসলাম যুগে খাদ্যের ভয়ে কিংবা কন্যা সন্তানদের অহেতুক বিড়ম্বনা মনে করে হত্যা করত এবং জীবন্ত সমাধিস্থ করত। তিনি আল কুরআনের বাণী উল্লেখ করেন, ' দারিদ্র্যের ভয়ে তোমরা তোমাদের কন্যা সন্তানদের হত্যা করোনা, জীবন্ধ সমাধিস্থ করোনা। কেননা, আমিই তোমাদের ও তাদের জীবিকার ব্যবস্থা করি।

৮. জাহিলী যুগে নারীদেরকে পণ্য দ্রব্যের মত ব্যবহার করা হতো। আরব ছাড়াও অন্যান্য দেশে যেমন ভারতে সত্বীদাহ প্রথা বা সহমরণ চালু ছিল। ইয়াহুদিগণ নারীকে দোযখের কীট বলত। নারীকে পাপের উৎস মনে করত, সেখানে অবহেলিত ও বঞ্চিত নারী জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবি (সা.) ঘোষণা করেন, 'মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত।

ধর্ম মানবজাতিকে উৎকৃষ্ট মানুষ তৈরির অন্যতম উপাদান। ধর্মবিশ্বাস মানুষকে নৈতিক চরিত্রে বলিয়ান করে, আচার-আচরণে আনয়ন করে নম্রতা, ভদ্রতা, শিষ্টতা, দূর করে অশান্তি, হিংসা, বিদ্বেষ ও হানাহানি। ইসলামি শিক্ষা হল মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ নেই। সাদা-কালো সকল মানুষই আল্লাহর সৃষ্টি। ইসলামি সমাজ ব্যবস্থায় হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান তথা ধর্মীয় পরিচয় গৌণ, সবচেয়ে বড় পরিচয় হল সবাই মানুষ। তারা তাদের স্ব স্ব ধর্মীয় বিশ্বাস, ইবাদত ও উপাসনায় সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন।

ইসলাম ধর্মীয় বা অন্য কোনো অজুহাতে মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টির অনুমতি দেয় না। বরং ইসলাম জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষের শান্তিপূর্ণ বসবাস ও সহাবস্থানের পক্ষে। রাষ্ট্রের সকল মানুষ নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে। এতে রাষ্ট্র সহযোগিতা প্রদান করবে। ঐতিহাসিক মদিনা সনদ এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ। সর্বপ্রকার সৎ ও কল্যাণজনক কাজের আদেশ দেয়া এবং তা বাস্তবায়িত করা রাষ্ট্রের বিশেষ কর্তব্য। অনুরূপভাবে পাপ ও অকল্যাণজনক কাজে বাঁধা দেয়া, মূলোৎপাটন করাও রাষ্ট্রের দায়িত্ব। এমনিভাবে মুসলিম ছাড়াও অমুসলিমগণের জন্য তাদের উপাসনালয় নির্মাণ ও এর সংরক্ষণ রাষ্ট্রের দায়িত্ব। কোনোরূপ ধর্মীয় উন্মাদনা ও গোঁড়ামী থেকে রাষ্ট্রের সকর নাগরিকদের হেফাজত করবে রাষ্ট্র। সমাজে বা রাষ্ট্রে বিভিন্ন ধর্ম-বর্ণ, ভাষা ও সংস্কৃতির লোক বাস করে। সমাজে শান্তির জন্য পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতি ও ভালোবাসা থাকা অতি জরুরি। কোনো এক যুদ্ধে অমুসলিমগণের উপাসসনালয় আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। খলিফাতুল মুসলিমীন হযরত উমর ফারুক (রা.) বায়তুল মাল তথা রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে অর্থ প্রদানপূর্বক তা মেরামত করেছিলেন। ধর্মীয় উন্মাদনা, গোঁড়ামী, ধর্মহীনতা, হানাহানি মূলত ধর্মীয় অজ্ঞতার ফসল। ইসলামের সুমহান আইন ও নীতির সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। বাড়াবাড়ি, উগ্রতা, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। চন্দ্র ও

সূর্য, আলো ও বায়ু যেমন সবার জন্য সমান ও অবারিত কল্যাণ নিশ্চিত করে তেমনি ইসলামও সবার জন্য অবারিত।

একবার একজন সাহাবী রাসূলে কারীম (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন 'আসাবিয়্যাত' (সাম্প্রদায়িকতা) কী? জবাবে রাসূল (সা.) ইরশাদ করলেন, 'অন্যায় কাজে স্বগোত্র-স্বজাতির পক্ষে দাঁড়ানো'। (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস: ৫০৭৮)।

আমাদের উচিত, সকল ধর্মের অনুসারীদের সঙ্গে সম্প্রীতি ও সদ্ভাব বজায় রাখা, সকল ধর্মের প্রতি সহনশীল হওয়া। আল্লাহ বলেন, 'মুশরিকদের মধ্যে কেউ যদি আপনার কাছে আশ্রয় চায়, তা হলে আপনি তাকে আশ্রয় দেবেন, এরপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেবেন।' (সুরা তাওবা, আয়াত: ৬)

মুসলিম রাষ্ট্রে অমুসলিমদের অধিকার

যেকোনো মুসলিম দেশে বসবাসকারী অমুসলিমদের নিরাপত্তার দায়িত্ব করা রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। কোনো অমুসলিম যেন কোনোভাবেই মুসলিমদের মাধ্যমে জুলুমের শিকার না হন, তা নিশ্চিত করতে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোনো অমুসলিম নাগরিকের ওপর জুলুম করে, বা তার কোনো ক্ষতি করে, বা তার ওপর সাধ্যাতীত কোনো বিষয়ের বোঝা চাপিয়ে দেয়, অথবা তার সন্তুষ্টি ছাড়া কোনো কিছু ছিনিয়ে নেয়, কিয়ামতের দিন আমি তার বিরুদ্ধে অমুসলিমের পক্ষে প্রতিবাদকারী হব।' (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস : ৩০৫১)

অন্য হাদিসে রাসুল (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি কোনো অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করল সে জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুঘ্রাণ ৪০ বছরের দূরত্ব থেকেও পাওয়া যায়।' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৩১৬৬)

যদি সে তোমার কাছে ঋণ চায় তাহলে ঋণ দেবে, যদি তোমার সহযোগিতা চায় তাহলে তাকে সহযোগিতা করবে, যদি সে অসুস্থ হয়ে পড়ে তাহলে তার খোঁজখবর নেবে, তার কোনোকিছুর প্রয়োজন হলে তাকে তা দেবে, সে অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়লে তার খোঁজখবর নেবে, যখন সে ভালো কিছু লাভ করবে তখন তাকে শুভেচ্ছা জানাবে, যদি সে বিপদে পড়ে তাহলে সান্ত্বনা দেবে, মৃত্যুবরণ করলে তার জানাযায় শরিক হবে, তার অনুমতি ছাড়া তোমার ঘর এত উঁচু করবে না যে তার ঘরে বাতাস ঢুকতে পারে না, কোনো ভালো খাবার রান্না করলে তাকে এর ঘ্রাণ ছড়িয়ে কষ্ট দেবে না, তবে যদি তার ঘরেও সে খাবার থেকে কিছু পৌঁছে দাও। যখন কোনো ফল কিনে তোমার বাড়িতে নেবে তখন হাদিয়াস্বরূপ তাকে সেখান থেকে কিছু দেবে। [খারায়েতী, তবারানী, আবুশ শায়খ- ফাতহুল বারী, খ. ১০, পৃ. ৫১৯, কিতাবুল আদব, বাব-৩১]

দেখুন, ইসলামে কত সুস্পষ্টভাবে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় অমুসলিমদের অধিকারের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অমুসলিমদের বিষয়ে সবাইকে সচেতন থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। তাদের ওপর জুলুম করা, তাদের অধিকার খর্ব করা, নিরাপত্তা বিঘ্নিত করা ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

আজকের দিনে সারা বিশ্বে ইসলাম বিদ্বেষীদের মুখে একই সুর মুসলিম রাষ্ট্রে অমুসলিমদের অধিকার সুরক্ষিত নয়, অথচ ইসলাম সর্ব প্রথম পৃথিবীর বুকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপন করেছে। প্রথমত অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করার সুযোগ নাই।

ধর্মের ব্যাপারে যে কোন ধরনের শক্তি প্রয়োগ ও জবরদস্তি ইসলামে সম্পূর্ন নিষিদ্ধ। মহান আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন, **“**দ্বীনের ব্যাপারে কোন বাড়াবাড়ি নেই।**”** (সূরা বাকারা, আয়াত : ২৫৬)

একটি মুসলিমে দেশে শুধু অমুসলিমদের কে শান্তিতে বসবাস করতে বলে না বরং রাষ্ট্র তাদের সার্বিক নিরাপত্তা এবং সুখ সমৃদ্ধি ও নিশ্চিত করে।

তাছাড়া ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের যাদের সাথে কোন সংঘাত নেই, এবং মুসলিদের সাথে শান্তিতে বসবাস করে তাদের প্রতি ইসলাম ইনসাফ করার জন্য ও ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন, **“**আল্লাহ নিষেধ করেন না ঐ লোকদের সাথে সদাচার ও ইনসাফ পূর্ণ ব্যবহার করতে যারা তোমাদের সাথে ধর্মকেন্দ্রিক যু*দ্ধ লিপ্ত হয়নি এবং তোমাদের আবাস ভূমি থেকে তোমাদের বের করে দেইনি। নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফকারীদের পছন্দ করেন।**”** (সূরা আল- মুমতাহিনা, আয়াত : ৮) আল্লাহ তায়া'লা ঈমানের দাবিদার প্রতিটি মুসলিমকে পরধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা ও শ্রদ্ধা দেখাতে নির্দেশ দিয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন, **“**তারা আল্লাহ তা'আলা বদলে যাদেরকে ডাকে, তাদেরকে তোমরা কখনো গালি দিওনা নইলে তারাও শত্রুতার কারনে না জেনে আল্লাহ তা'আলা কেও গালি দিবে। আমি প্রত্যেক জাতির কাছেই তাদের কার্যকলাপ সুশোভনীয় করে রেখেছি, অতপর সবাইকে একদিন তার মালিকের কাছে ফিরে যেতে হবে, তারপর তিনি তাদের বলে দিবেন, তারা দুনিয়ার জীবনে কে কী কাজ করে এসেছে।**”**
(সূরা আল-আন'আম, আয়াত : ১০৮)

<u>ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় অমুসলিম নাগরিকদের মৌলিক অধিকারঃ</u>

❖ **প্রাণের নিরাপত্তা :**

অমুসলিম নাগরিকদের রক্তের মূল্য মুসলমানদের রক্তের মূল্যের সমান। কোন মুসলিম যদি অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করে, তাহলে একজন মুসলমান নাগরিক কে হত্যা করলো, যেমন তাকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হতো ঠিক তেমনি মৃত্যুদন্ড দেওয়া হবে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আমলে জনৈক মুসলমান অন্যন্য

ধর্মাবলম্বীদের প্রতি হত্যা করলে তিঁনি খুনি কে মৃত্যুদন্ড দেন। তিঁনি বলেন, যে নাগরিকের নিরাপত্তার দায়িত্ব নেয়া হয়েছে, তার রক্তের বদলা নেয়ার দায়িত্ব আমারই। (বায়হাকী, হাদীস : ১৫৯৩৪)

অন্য হাদীসে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, “যে ব্যক্তি কোনো অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করল, সে জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না, অথচ জান্নাতের সুগন্ধি ৪০ বছরের রাস্তার দূরত্ব থেকেও পাওয়া যায়।” (সহীহ বুখারী, হাদীস : ৩১৬৬)

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন, “যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কোনো অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করবে, আল্লাহ তার ওপর জান্নাত হারাম করে দেবেন।” (মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২০৬৪৮,২০৩৭৭)

- **ফৌজদারি দন্ডবিধি :**

ফৌজদারি দন্ডবিধি মুসলিম অমুসলিম সকলের জন্য সমান, অপরাধের যে সাজা মুসলিমরা পাবে, সে সাজা অমুসলিমদের উপরও প্রয়োগ হবে। যেমন, “কোন অমুসলিম নাগরিক যদি মুসলমানদের জিনিস চুরি করে, এবং কোন মুসলিম যদি অমুসলিম নাগরিকদের জিনিস চুরি করে, তাহলে উভয়ের উপর হাত কাঁটার বিধান প্রয়োগ হবে।” (আল মাবসুত, ৯ম খন্ড, পৃ. ৫৭-৫৮)

- **দেওয়ানি আইন :**

দেওয়ানি আইন ও উভয়ের সমান। তাদের সম্পত্তি আমাদের সম্পত্তির মতো, তাই তাদের সম্পদের হেফাজত করাও মুসলমানদের দায়িত্ব। ব্যবসায়িক যে সব পন্থা মুসলমানদের জন্য নিষিদ্ধ, তেমনি অমুসলিমদের জন্য ও তবে শুধুমাত্র শুকর বেচাকেনা, খাওয়া এবং মদ বানানো, খেতে ও বেচাকেনা করতে পারবে।

- **সম্মানের হেফাজত :**

যেমন কোন মুসলিম কে নিয়ে ঠাট্টা গীবত মারপিট করা অবৈধ, তেমনি এসব কাজ অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের বেলায় ও অবৈধ।

- **পারিবারিক বিষয়াদি :**

অমুসলিম নাগরিকদের পারিবারিক কর্মকাণ্ড নিজস্ব পারিবারিক আইন অনুযায়ী ধর্তব্য হবে। এক্ষেত্রে তাদের উপর ইসলামী কানুন কার্যকর করা হবেনা। মুসলিমদের ঘরোয়া জীবনে যে সব জিনিস অবৈধ, তা যদি অমুসলিমদের ধর্মীয় ও জাতীয় আইনে বৈধ হয়। তাহলে ইসলামি আদালত তাদের আইন অনুযায়ী ফয়সালা দিবে।

❖ উপাসনালয়ের নিরাপত্তা :

ইসলমী রাষ্ট্রের শাসক অমুসলিম নাগরিকদের উপাসনালয় গুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। এই উপসনালয়গুলো ভেঙ্গে ফেলা সাধারণ পরিবেশে তো দূরের কথা যুদ্ধ অবস্থায় ও হামলা করা যাবেনা।

❖ অমুসলিমদের ধর্মীয় উৎসবের অধিকার:

ইসলাম তার অনুসারীদের ধর্মীয় বিধি-বিধান, আচার-অনুষ্ঠান, উৎসব ও সংস্কৃতি পালনে যেমন অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে তেমনি সমাজে অবস্থানরত অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি সদয় ও উদার হওয়া এবং তাদের উপাসনা ও উৎসব পালনে বিঘ্ন সৃষ্টি না করার বিষয়েও জোর তাগিদ দিয়েছেনা।তাই ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ধর্মগ্রন্থ, উপাসনালয় ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান নিয়ে কোনোরূপ ব্যঙ্গ-বিদ্রপ গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আল্লাহকে ছেড়ে যাদের তারা (মূর্তিপূজক) ডাকে, তাদের তোমরা গালি দিও না। তাহলে তারা সীমালঙ্ঘন করে অজ্ঞানতাবশত আল্লাহকেও গালি দেবে। (সূরা আনয়াম : ১০৮)।

ইসলাম সব ধর্মের স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছে। ধর্ম পালনে কেউ বাধাগ্রস্ত হবে না। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'তোমাদের দীন তোমাদের জন্য, আমার দীন আমার জন্য'। (সূরা কাফিরুন : ০৬)

প্রতিবেশী হিসেবে অমুসলিমদের সাথে আচরণ

প্রতিবেশীর অধিকার রক্ষা করা : সব ধর্মের মানুষ প্রতিবেশী হতে পারে। প্রতিবেশী যে ধর্মেরই হোক প্রতিবেশী হিসেবে তাদের প্রতি সদয় আচরণ, পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতা প্রদর্শনে কোনো প্রকার ত্রুটি করা যাবে না।

আল্লাহর নবী (সা.) অমুসলিমদের সঙ্গে কেমন আচরণ করতেন, সে-সম্পর্কে জাবের (রা.) বর্ণনা করেন, 'একদিন আমাদের পাশ দিয়ে একটি লাশ নিয়ে যাচ্ছিল। দেখে রাসুল (সা.) দাঁড়িয়ে গেলেন। তার দেখাদেখি আমরাও দাঁড়ালাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'আল্লাহর রাসুল, এটা তো এক ইহুদির লাশ। রাসুল (সা.) বললেন, 'যখন কোনো লাশ নিতে দেখবে, তখন দাঁড়াবে।' (বুখারি, হাদিস: ১৩১১)

প্রতিবেশী ও আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে চলার এই যে নির্দেশনা, তাতে মুসলিম-অমুসলিমের মাঝে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। এমনটি বলা হয়নি- তোমার প্রতিবেশী কিংবা আত্মীয় যদি মুসলমান হয়, ধার্মিক

হয়, ভালো মানুষ হয়, তাহলে তার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে চলবে। বরং প্রতিবেশী ও আত্মীয় যেমনই হোক, মুসলমান হোক কিংবা না হোক, তার অধিকার অকাট্য ও অনস্বীকার্য। একজন মুসলমানকে এ অধিকার রক্ষা করেই জীবনযাপন করতে হবে।

সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা.-এর ঘটনা। একদিন তার ঘরে একটি বকরি জবাই করা হল। খাবার রান্না হলে তিনি তার গোলামকে জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের ইহুদি প্রতিবেশীকে কি এ খাবার দিয়েছ?' এরপর তিনি বললেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, প্রতিবেশীর বিষয়ে জিবরাইল আমাকে এত উপদেশ দিচ্ছিলেন, আমি মনে করছিলাম, তিনি হয়ত তাদেরকে ওয়ারিশই বানিয়ে দেবেন।' -জামে তিরমিযী, হাদীস : ১৯৪৩

হযরত উমর রা.-এর একটি ঘটনা। তিনি তখন খলীফাতুল মুসলিমীন। একদিন এক ইহুদি বৃদ্ধকে দেখলেন মসজিদের দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করে বেড়াতে। তখন তিনি ইহুদিকে লক্ষ করে বললেন,

আমরা তোমার ওপর ইনসাফ করতে পারিনি যদি তোমার যৌবনে আমরা তোমার নিকট থেকে জিযয়া গ্রহণ করে থাকি আর তোমার বার্ধক্যে তোমাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেই। এরপর তিনি তার জন্যে বায়তুল মাল থেকে প্রয়োজনীয় ভাতার ব্যবস্থা করে দেন। -কিতাবুল আমওয়াল, ইবনে যানজূয়াহ্, ১/১৪৩, হাদীস ১৭৯

অমুসলিমদের সাথে সুন্দর ও সৌজন্যপূর্ণ আচরণ রক্ষার শিক্ষাপ্রদানের পাশাপাশি ইসলাম তাকিদের সাথে বারবার এ নির্দেশও দিয়েছে- 'কোনো মুসলমান যেন কাফেরদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করে।' এবং এ তাকিদও করেছে, সৌজন্য ও উদারতার নামে যেন নিজেদের দ্বীনদারি আক্রান্ত না হয়। দ্বীনের বিষয়ে আপোস করা কোনোক্রমেই বৈধ নয়। এমনিভাবে সদাচরণের ক্ষেত্রে কোনো অমুসলিমকে মুসলিম ভাই থেকে প্রাধান্য দেওয়াও বৈধ নয়।

ইসলাম অমুসলিমের সঙ্গে সুন্দর, সদয় ও সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ করতে নির্দেশ দেয়। কোরআনে আছে, ধর্মের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না। আল্লাহ তো ন্যায়পরায়ণদের ভালোবাসেন। (সুরা মুমতাহিনা, আয়াত: ৮)

যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘর-বাড়ি থেকে বহিষ্কার করেনি, তাদের সঙ্গে সদাচরণ করতে ও তাদের প্রতি ইনসাফ করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনসাফকারীদেরকে ভালোবাসেন। আল্লাহ তো তোমাদের তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেছেন, যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে তোমাদের ঘর-বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে এবং তোমাদেরকে বের করার কাজে একে অন্যের সহযোগিতা করেছে। যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে তারা জালিম। -(সূরা মুমতাহিনা :-০৯)

প্রতিবেশীর অধিকার রক্ষায় ইসলাম অত্যন্ত তৎপর। ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'জিবরাঈল (আ.) আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে অবিরত উপদেশ দিচ্ছিলেন, এমনকি আমি ধারণা করলাম যে, আল্লাহ তাদের ওয়ারিশ বানিয়ে দেবেন।' (বুখারি, হাদিস : ৫৬৬৮; মুসলিম, হাদিস : ৬৮৫৪)

সামাজিক প্রেক্ষাপটে আচরণ ও তাদের অধিকার

হজরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ইলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'সাবধান, যদি কোনো মুসলিম কোনো অমুসলিম নাগরিকের ওপর নিপীড়ন চালিয়ে তার অধিকার খর্ব করে, তার ক্ষমতার বাইরে কষ্ট দেয় এবং তার কোনো বস্তু জোরপূর্বক নিয়ে যায়, তাহলে কিয়ামতের দিন আমি তার পক্ষে আল্লাহর দরবারে অভিযোগ উত্থাপন করব।' সুনানে আবু দাউদ

সমাজবদ্ধভাবে জীবনযাপন করতে গিয়ে নানা শ্রেণির নানা পেশার নানা মত ও পথের মানুষের মুখোমুখি হতে হয়। মুখোমুখি হতে হয় অমুসলিমদেরও। লেনদেন ওঠাবসা চলাফেরা সাহায্য-সহযোগিতা ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে একজন মুসলমান ও একজন অমুসলমানের সাক্ষাৎ হতে পারে। কোনো মুসলিমপ্রধান দেশে অমুসলিমদের বসবাস কিংবা কোনো অমুসলিমপ্রধান দেশে মুসলমানদের বসবাস এখন বিচিত্র কিছু নয়। অমুসলিম ব্যক্তি হতে পারে কোনো মুসলমানের প্রতিবেশী। কোনো অমুসলিম যদি পুরনো ধর্ম ছেড়ে ইসলামের শীতল ছায়ায় আশ্রয় নেয়, তাহলে তো আরও অনেক অমুসলিমের সাথে তার আত্মীয়তার সম্পর্কও থাকবে। বর্তমান সময়ে পৃথিবীতে যেভাবে দলে দলে অমুসলিম ইসলামের ছায়াতলে আসছে, তাতে এ বিষয়টি খুবই প্রাসঙ্গিক।

অমুসলিমদের সঙ্গে সামাজিক কাজকর্ম করা যাবে: অনেক সাহাবা কিরাম অমুসলিমের অধীনে কাজ করেছেন এবং অমুসলিমকে দিয়ে নিজেদের কাজ করিয়েছেন। আলী (রা.) কূপ থেকে প্রতি বালতি পানি উত্তোলনের বিনিময়ে একটি করে খেজুর দেবে, এই শর্ত ইহুদির কাজ করেছেন।[সুনান তিরমিযী, হাদীস ২৪৭৩]

রাসূল (সা.) এক ইহুদির কাছে বর্ম বন্ধক দিয়ে কিছু ঋণ এনেছিলেন।[সহীহ বুখারী, হাদীস ২৩৮৬] আম্মাজান আয়েশা, আলী, ও উমর (রা.) প্রমুখ অমুসলিম প্রতিবেশীর বাসায় খাবার আদান-প্রদান করতেন।[সুনান আবু দাউদ, হাদীস ৫১৫২] বোঝা গেল, বিশ্বাস ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে অমুসলিমদের সঙ্গে সামাজিক কাজকর্ম করা যাবে

ইসলাম অমুসলিমদের সাথে ভালো ব্যবহারের শিক্ষা দেয়

হজরত আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন, আমার অমুসলিম মা আমার কাছে এলেন। আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে জানতে চাইলাম—আমি কি তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবো? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'হ্যাঁ'।(বুখারি)

একবার বিশ্বনবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে দিয়ে এক ইয়াহুদির লাশ নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল আর এতে ওই লাশের সম্মানার্থে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। তখন হজরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! এটি তো ইয়াহুদির লাশ! তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, সে কি মানুষ নয়?'(বুখারি)

ধর্মে-বর্ণে বৈচিত্র্য থাকলেও সৃষ্টিগতভাবে সব মানুষই এক। সবাইকে মহান আল্লাহ আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) থেকে সৃষ্টি করেছেন। সর্বোপরি তিনি মানুষকে সম্মানিত করেছেন এবং সব সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন করেছেন। ইসলাম আল্লাহর মনোনীত ধর্ম।

তথাপি সমাজে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ বসবাস করে। এ ক্ষেত্রে ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য ইসলাম বিশেষ নির্দেশনা দিয়েছে। সেগুলো যথার্থভাবে বাস্তবায়িত হলে পারস্পরিক সুসম্পর্ক, সামাজিক শান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় থাকবে, ইনশাআল্লাহ।

ক)প্রাণ-সম্পদের নিরাপত্তা প্রদান : যেসব অমুসলিম মুসলিম দেশে রাষ্ট্রের আইন মেনে বসবাস করে অথবা ভিসা নিয়ে মুসলিম দেশে আসে, তাদের সুরক্ষা এবং জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি কোনো অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করল, সে জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না, অথচ তার সুগন্ধ ৪০ বছরের রাস্তার দূরত্ব থেকেও পাওয়া যায়।' (বুখারি, হাদিস : ২৯৯৫)

খ)ধর্মীয় আচরণ: প্রত্যেকে নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে। মুসলিম সমাজেও অমুসলিমরা নিজেদের পরিমণ্ডলে ধর্মীয় উৎসব উদযাপন করবে। অমুসলিমদের যেসব রীতি-নীতি ও আচার-অনুষ্ঠান ধর্ম পালনের অংশ, সেগুলোতে মুসলিমদের অংশগ্রহণ করার সুযোগ নেই। আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের দ্বিন তোমাদের, আমার দ্বিন আমার।' (সুরা : কাফিরুন, আয়াত : ৬)

গ)বল প্রয়োগ করে ইসলাম নয় : ইসলামের সৌন্দর্যে অনুপ্রাণিত হয়ে যুগে যুগে মানুষ স্বেচ্ছায় ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছে। কোনো ধরনের চাপ বা বল প্রয়োগ করে ইসলামে দীক্ষিত করার কোনো বিধান নেই। আল্লাহ বলেন, 'দ্বিন সম্পর্কে জোর-জবরদস্তি নেই; সত্য পথ ভ্রান্ত পথ থেকে সুস্পষ্ট হয়েছে। যে তাগুতকে অস্বীকার করবে ও আল্লাহর ওপর ঈমান আনবে সে এমন এক মজবুত হাতল ধরবে, যা কখনো ভাঙবে না। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, প্রজ্ঞাময়।' (সুরা : বাকারা, আয়াত : ২৫৬)

ঘ) লেনদেনে আচরণ: আর্থিক লেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্য ও সেবার আদান-প্রদান সব ধর্মের মানুষের সঙ্গে পরিচালনা করতে কোনো বাধা নেই। রাসুলুল্লাহ (সা.) অনেকবার ইহুদিদের কাছ থেকে ঋণ নিয়েছেন এবং

যথাসময়ে তা পরিশোধ করে দিয়েছেন। একবার একজন ঋণদাতা ইহুদি নির্ধারিত সময়ের আগেই এসে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে খারাপ আচরণ করে। রাসুলুল্লাহ (সা.) এর কোনো প্রতিবাদ না করে ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করতে সাহাবাদের নির্দেশ দেন।

ঙ)মানবিক আচরণ : সব মানুষের প্রতি উদার মনোভাব পোষণ ও মানবীয় আচরণ প্রদর্শন ইসলামের অন্যতম শিক্ষা। কারণ মানুষ হিসেবে সবাই সমান। আল্লাহ সব মানুষকে সম্মানিত করেছেন। হাদিসে এসেছে, একদিন সাহল ইবনে হুনাইফ (রা.) ও কায়েস ইবনে সাদ (রা.) কাদেসিয়াতে বসা ছিলেন। তখন তাঁদের পাশ দিয়ে একটি লাশ নিয়ে কিছু লোক অতিক্রম করল। তাঁরা দাঁড়িয়ে গেলেন। তখন তাঁদের বলা হলো, লাশটি অমুসলিমের। তাঁরা বলেন, মহানবী (সা.)-এর পাশ দিয়ে একসময় একটি লাশ নেওয়া হয়েছিল। তখন তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁকে বলা হলো, এটা তো এক ইহুদির লাশ। তখন তিনি বলেন, 'তা কি প্রাণ নয়?' (বুখারি, হাদিস : ১২৫০)

চ) পারস্পরিক সহযোগিতা : পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা ও অন্যের প্রয়োজনে এগিয়ে আসা ইসলামী সমাজব্যবস্থার একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। এটি মুসলিম-অমুসলিম সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আল্লাহ বলেন, 'দ্বিনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদের স্বদেশ থেকে বহিষ্কার করেনি তাদের সঙ্গে মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না। আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদের ভালোবাসেন।' (সুরা : মুমতাহিনা, আয়াত : ৮)

ছ) অসুস্থ হলে শুশ্রূষা করা : অমুসলিম রোগীকে দেখতে যাওয়াও সুন্নত। নবী (সা.) অমুসলিম রোগীদের দেখতে যেতেন এবং তাদের ঈমানের দাওয়াত দিতেন। তাদের সেবা করতেন। আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ইহুদি নবী (সা.)-এর খেদমত করত। সে অসুস্থ হলে নবী (সা.) তাকে দেখতে গেলেন। তার মাথার দিকে বসে নবীজি বলেন, তুমি ইসলাম গ্রহণ করো। তখন সে তার পিতার দিকে তাকাল। পিতা বলেন, তুমি আবুল কাসেমের (নবীর) অনুসরণ করো। ফলে সে ইসলাম গ্রহণ করল। তখন নবী (সা.) এই বলে বের হলেন, 'আল্লাহর শুকরিয়া, যিনি তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়েছেন।' (বুখারি, হাদিস : ১২৯০)

অন্য সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ

'ধর্ম যার যার উৎসব সবার' একটি ইসলাম বিরোধী বক্তব্য। অনেকেই বিশ্বাস করেন যে, নিজের ধর্ম পালন করার পাশাপাশি কাফিরদের ধর্মীয় উৎসবে অংশগ্রহণ করলেও সমস্যা নেই, তারাতো আমাদেরই প্রতিবেশী। তাদের উক্ত ধারণা যেমন ভুল, তেমনি ইসলামী সংস্কৃতিকে বিধর্মীয় সভ্যতা দ্বারা বিকৃত করার ষড়যন্ত্রের অংশ। কারণ ইসলামী শরী'আতে কাফিরদের কুফরী ও শিরকী উৎসবে সহযোগিতা করা ও অংশগ্রহণ করা হারাম। আল্লাহ মুমিনদের সম্পর্কে বলেন, 'যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না, আর অনর্থক কর্মকা-ের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলে সসম্মানে পাশ কাটিয়ে চলে যায়' (সূরা আল-ফুরক্বান : ৭২)। উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনু কাছীর (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'আল্লাহর সৎ বান্দাদের আরো বিশেষণ বর্ণনা করা হচ্ছে যে, তারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না অর্থাৎ শিরক করে না, মূর্তিপূজা হতে তারা বেঁচে থাকে। তারা মিথ্যা কথা বলে না, পাপাচারে লিপ্ত হয় না, কুফরী করে না, অসার ক্রিয়া-কলাপ হতে দূরে থাকে, গান শুনে না এবং মুশরিকদের আনন্দ উৎসবে যোগদান করে না' (তাফসীর ইবনু কাছীর, ৬ষ্ঠ খ-, পৃ. ১৩০ 'সূরা আল-ফুরক্বানের ৭২নং আয়াত)। ইমাম যাহাবী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'মুসলিমগণ কাফিরদের কোন উৎসবে অংশ নিবে না, যা কিনা তাদের ধর্মের সাথে সম্পর্কযুক্ত। ঠিক যেমন করে কোন মুসলিম অন্য ধর্মের অনুশাসন এবং উপাসনার লক্ষ্যবস্তুগুলোকে গ্রহণ করতে পারে না' (তাশাব্বুহুল খাসিস বি আহলিল খামিস, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৯৩)।

অমুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি সম্মানবোধ

ইসলামের মধ্যে কাটছাঁটের মাধ্যমে আপসের প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন রাসুলুল্লাহর কাছে। তাদের এ প্রস্তাবের জবাব আল্লাহই ওহির মাধ্যমে জানিয়ে দেন। আল্লাহ পাক বলেন, হে নবী আপনি বলে দিন -

'তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম। আমার জন্য আমার ধর্ম।' (সুরা : কাফিরুন, আয়াত : ৬)

আর একবারের ঘটনা। মক্কার পৌত্তলিক কুরাইশ সর্দাররা একদিন রাসুলুল্লা সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে এসে বলল,

'হে মুহাম্মদ, তুমি যদি সুন্দরী নারী চাও, আমরা তোমাকে পরমা সুন্দরী নারী দেব। তুমি যদি সিংহাসন চাও, তা-ও আমরা তোমাকে দান করব। শুধু তুমি এ ধর্মটি প্রচার করা ছেড়ে দাও।'

উত্তরে রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

‘হে কুরাইশরা, তোমরা যদি আমার এক হাতে সূর্য আর অন্য হাতে চন্দ্র এনে দাও, তথাপি আমি যে সত্যের সন্ধান পেয়েছি, তা প্রচার থেকে বিরত হব না।’ [মানুষের নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্দুল জব্বার সিদ্দিকী, পৃ. ৭০]

তাই বলে ইসলামে কাটছাঁটের প্রশ্নই ওঠে না। নিজের ধর্মে অটল থেকে শান্তির জন্য অন্য ধর্মাবলম্বীদের তাদের ধর্ম পালনে সমান অধিকার দেওয়াই রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর আদর্শ। এটাই ইসলাম। এ জন্যই ইসলামের এক অর্থ আনুগত্য, অন্য অর্থ শান্তি। আনুগত্য মানে আল্লাহর আনুগত্য। আল্লাহর আনুগত্য মানে কোরআন-সুন্নাহর নির্দেশিত পথে অটল, অনড় ও অবিচল থাকা। আর শান্তি মানে মানুষে মানুষে সাম্য, জাতিতে জাতিতে মৈত্রী, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে সম্প্রীতি।

সত্যিকারের মুসলিম ব্যক্তি কখনো সাম্প্রদায়িক হতে পারেন না, যিনি সত্যিকারভাবে ইসলামকে বুঝতে পেরেছেন, তিনি কখনো অন্য ধর্মের প্রতি বিদ্বেষী হতে পারেন না। যিনি সত্যিকার মুসলিম, তিনি কখনো অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি শত্রুতামূলক আচরণ করতে পারেন না। যিনি সত্যিকার মুসলিম, তিনি কখনো দল-উপদলে বিভক্ত হতে পারেন না। কেননা হযরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে হযরত শিশ আলাইহিস সালাম, হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম, হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম, হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম, হযরত মুসা আলাইহিস সালাম, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামসহ শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত আল্লাহ প্রেরিত প্রত্যেক নবী-রাসুলই ধারাবাহিকভাবে যে ধর্ম প্রচার করে গেছেন, তা-ই ইসলাম।

দুনিয়ার প্রথম মানুষ ও নবী হযরত আদম আলাইহিস সালাম যে ঐশী ধর্ম প্রচার ও প্রতিষ্ঠা শুরু করেন, শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর হাতে এসে সে ধর্মই পূর্ণতা লাভ করেছে। অন্যদিকে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর অনুসারীরা যেমন মুসলিম নামে খ্যাত, তেমনি মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর আগের নবীদের অনুসারী যাঁরা ছিলেন, ইসলামের পরিভাষায় তাঁরাও মুসলিম। পূর্ববর্তী প্রত্যেক নবী পরবর্তী প্রত্যেক নবীর পূর্বসূরি ও পরবর্তী প্রত্যেক নবী পূর্ববর্তী প্রত্যেক নবীর উত্তরসূরি বা পতাকাবাহী।

তাই বিশ্বাসীদের কথা হলো,

‘আমরা আল্লাহর রাসুলদের মধ্যে পার্থক্য করি না।’ (সুরা : বাকারা, আয়াত : ২৮৫)

অমুসলিমের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা

আত্মীয় অমুসলিম হলেও সম্পর্ক রক্ষা করতে বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, ‘তোমার মাতা-পিতা যদি তোমাকে পীড়াপীড়ি করে আমার সমকক্ষ দাঁড় করাতে যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তুমি তাদের কথা মানবে না, তবে পৃথিবীতে তাদের সঙ্গে বসবাস করবে সদ্ভাবে।’ (সুরা : লোকমান, আয়াত : ১৫)

আসমা বিনতে আবু বকর (রা.) বলেন, রাসুলের যুগে আমার মা আমার কাছে এলেন মুশরিক অবস্থায়। তখন আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করলাম, আমার মা এসেছেন, তিনি অমুসলিম। আমি কি তাঁর আত্মীয়তা রক্ষা করব? নবী (সা.) বলেন, হ্যাঁ, তাঁর সঙ্গে আত্মীয়তা রক্ষা করো। (বুখারি, হাদিস : ২৪৭৭)

মুসলিম রাষ্ট্রে অমুসলিম সম্প্রদায়ের অধিকার ও কর্তব্য

একটি রাষ্ট্রের মধ্যে বিভিন্ন ধর্ম ও বর্ণের মানুষ বসবাস করবে এটাই স্বাভাবিক; কিন্তু ধর্ম ও বর্ণ আলাদা হলেও তাদের মূল জাতিসত্তা এক—সবাই মানুষ। আল্লাহতায়ালা বলেন, ‘সকল মানুষ একই জাতিভুক্ত।’ (সুরা বাকারা, আয়াত: ২১৩)

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘সমস্ত সৃষ্টিজগৎ আল্লাহর পরিবারস্বরূপ। সুতরাং সৃষ্টিজগতের মধ্যে সেই আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয়, যে আল্লাহর পরিবারের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করে।’ (বায়হাকি)

পরিবারের সদস্যদের মতো সব মানুষের সঙ্গে সদ্ভাব ও সম্প্রীতি বজায় রাখা মানুষের নৈতিক দায়িত্ব। ইসলাম সকল ধর্মাবলম্বীর ধর্মীয় বিশ্বাসের স্বাধীনতা দিয়েছে। দেশের সব নাগরিক স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালন করতে পারবে। এতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা যাবে না। আল্লাহ বলেন, ‘তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন, আমার জন্য আমার দ্বীন।’ (সুরা কাফিরুন, আয়াত: ৬)

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা : আত্মীয় অমুসলিম হলেও সম্পর্ক রক্ষা করতে বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, ‘তোমার মাতা-পিতা যদি তোমাকে পীড়াপীড়ি করে আমার সমকক্ষ দাঁড় করাতে যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তুমি তাদের কথা মানবে না, তবে পৃথিবীতে তাদের সঙ্গে বসবাস করবে সদ্ভাবে।’ (সুরা : লোকমান, আয়াত : ১৫)

আসমা বিনতে আবু বকর (রা.) বলেন, রাসুলের যুগে আমার মা আমার কাছে এলেন মুশরিক অবস্থায়। তখন আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করলাম, আমার মা এসেছেন, তিনি অমুসলিম। আমি কি তাঁর আত্মীয়তা রক্ষা করব? নবী (সা.) বলেন, হ্যাঁ, তাঁর সঙ্গে আত্মীয়তা রক্ষা করো। (বুখারি, হাদিস : ২৪৭৭)

অমুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব

ইসলামে সকল মানুষের সাথে সদাচরণ, ন্যায়বিচার ও মানবিক সম্পর্ক বজায় রাখার উপর জোর দেওয়া হয়েছে, এমনকি অমুসলিমদের সাথেও। তবে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বের বিষয়ে ইসলাম কিছু সতর্কতা অবলম্বন করতে বলে, বিশেষ করে যদি তা বিশ্বাস বা আধ্যাত্মিক মূল্যবোধে নেতিবাচক প্রভাব ফেলার সম্ভাবনা থাকে।

ইসলামিক দৃষ্টিকোণ:

১. ন্যায়বিচার ও সদাচরণ:
কুরআনে অমুসলিমদের সাথে ন্যায়বিচার ও সদাচরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে:

"আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না, যারা তোমাদের সাথে ধর্মে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে দেশ থেকে বের করে দেয়নি, তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করতে ও তাদের প্রতি ন্যায়বিচার করতে। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালোবাসেন।" (সূরা আল-মুমতাহিনা, ৬০:৮)

২. অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বের সীমা:
ইসলাম শত্রুতা বা অবিচারকে সমর্থন করে না, তবে বিশ্বাস ও মূল্যবোধের সংঘাত এড়াতে কিছু সীমা রাখে। কুরআনে বলা হয়েছে:

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইহুদি ও খ্রিস্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্যে যে কেউ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, সে অবশ্যই তাদের দলভুক্ত বলে গণ্য হবে। নিশ্চয় আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।" (সূরা আল-মায়িদা, ৫:৫১)

এই আয়াতটি মূলত সেইসব অমুসলিমদের কথা বলে যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষণ করে বা ঈমানের জন্য হুমকি স্বরূপ।

৩. প্রভাব ও আদর্শের প্রশ্ন:
যদি কোনো বন্ধুত্ব মুসলমানের ঈমান, আকিদা বা আমলের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে (যেমন: নামাজ-রোজা শিথিল করা, হারাম কাজে জড়িয়ে পড়া), তবে তা পরিহার করা উচিত।

তবে যদি অমুসলিম বন্ধু নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধে উত্তম হয় এবং ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকে, তাহলে সাধারণ সুসম্পর্ক রাখতে কোনো বাধা নেই।

যুদ্ধক্ষেত্রে অমুসলিমদের সাথে আচরণ

ইসলামে যুদ্ধক্ষেত্রে অমুসলিমদের সাথে আচরণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে, যা ন্যায়বিচার, মানবিকতা ও নৈতিক মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। নিম্নে কুরআন ও হাদীসের আলোকে কিছু মূলনীতা উল্লেখ করা হলো:

ক) যুদ্ধবস্থায় উপাসনালয়ে হামলা করা যাবেনা: ইসলামের বিধান হলো, ভিন্ন ধর্মের উপসনালয়ে সাধারণ অবস্থায় তো বটেই, যুদ্ধাবস্থায়ও হামলা করা যাবে না। কোনো ধর্মীয় পুরোহিতের প্রতি অস্ত্র তাক করা যাবে না। কোনো উপসনালয় জ্বালিয়ে দেওয়া যাবে না। রাসূলুল্লাহ (সা.) কোনো জনপদে সৈন্যদল প্রেরণকালে বলতেন, আমি তোমাদের (কয়েকটি উপদেশ দিয়ে) প্রেরণ করছি: (যুদ্ধক্ষেত্রে) তোমরা বাড়াবাড়ি করবে না, ভীরুতা দেখাবে না, কারো চেহারা বিকৃত করবে না, কোনো শিশুকে হত্যা করবে না, কোনো গির্জা জ্বালিয়ে দেবে না এবং কোনো গাছ উৎপাটন করবে না।[মুসান্নাফ আবদির রাযযাক, হাদীস ৯৪৩০]

খ) ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সন্ধির শর্ত: অমুসলিমরা ইসলামী রাষ্ট্রে "জিম্মি" হিসেবে নিরাপত্তা পেতে পারে, যদি তারা যুদ্ধ না করে। তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সম্পদের সুরক্ষা দেওয়া হয় (সূরা আত-তাওবাহ, ৯:২৯)।

গ)যুদ্ধবন্দীদের প্রতি সদয় আচরণ: কুরআনে বলা হয়েছে:
"তারা খাদ্য দান করবে অভাবগ্রস্ত, এতিম ও বন্দীকে—যদিও তারা নিজেরাই তা প্রয়োজনবোধ করে..." (সূরা আল-ইনসান, ৭৬:৮)'বন্দীদের সাথে মানবিক আচরণ ও পরে মুক্তিদানের নির্দেশ রয়েছে' (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭:৪)।

ঘ)নিরাপত্তা ও শান্তিচুক্তি:
রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মদিনার সনদে ইহুদি ও অন্যান্য গোত্রদের সাথে শান্তিচুক্তি করেছিলেন, যা ধর্মীয় সহাবস্থানের উদাহরণ।

তিনি বলেছেন: "যে ব্যক্তি কোনো অমুসলিম নাগরিকের (জিম্মি) প্রতি জুলুম করবে, আমি কিয়ামতে তার বিপক্ষে থাকব।" (সুনান আল-কুবরা, বাইহাকী)

ঙ)যুদ্ধের নিয়মাবলী:
ইসলামী আইনে যুদ্ধ শুধুমাত্র আত্মরক্ষা বা অত্যাচার প্রতিরোধের জন্য অনুমোদিত (সূরা আল-বাকারাহ, ২:১৯০)।

শত্রু আত্মসমর্পণ করলে বা শান্তি চাইলে তা গ্রহণ করতে নির্দেশ (সূরা আল-আনফাল, ৮:৬১)।

যে ধর্ম যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের সঙ্গে এরূপ আচরণের নির্দেশ দেয়, সেই ধর্ম সাধারণ অবস্থায় এবং স্বাভাবিক পরিবেশে অমুসলিমের সঙ্গে কী ধরনের আচরণের আদেশ করে, তা সহজেই অনুমেয়। এজন্য আমরা দেখতে পাই, মুসলমানদের সোনালি যুগে কোনো দেশে মুসলিম সৈন্য প্রবেশ করলে সাধারণ মানুষ স্বপ্রণোদিত হয়ে ইসলামধর্ম গ্রহণ করত। যুদ্ধ হতো শুধু সৈন্যদের সঙ্গে, বেসামরিক নাগরিকদের কিছুই বলা হতো না। তবু তারা ইসলাম গ্রহণ করত। কারণ তারা এর আগে দেখেছে, যুদ্ধ শুধু ধ্বংসযজ্ঞ বয়ে আনে। কোনো জনপদে বিদেশি সৈন্য এলে তারা সেখানকার পরিবেশ ধ্বংস করে দিত। একমাত্র মুসলিম সৈন্যরাই ছিলেন ব্যতিক্রম। মুসলিমদের অনুপম চরিত্র দেখে ইসলামের সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়ে ইসলামের পতাকাতলে আশ্রয় নিত।

অমুসলিমকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা যাবে না

ধর্ম চাপিয়ে দেওয়া ইসলাম সমর্থন করে না। কুরআন-সুন্নাহ কাউকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করার নির্দেশ দেয় না। সাম্য, শান্তি ও ন্যায়ের ধর্ম ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণের শাশ্বত আহ্বান সবসময় বিরাজমান ছিল এবং থাকবে। কিন্তু ইসলাম গ্রহণে কাউকে বাধ্য করে না। কুরআন কারীমে আল্লাহ তাআলা বলেন, দীন গ্রহণের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই।[সূরা বাকারা, হাদীস ২৫৬]

অমুসলিমদের বাড়িতে আসা-যাওয়া করা

ইসলাম কখনোই কোনো অমুসলিমের অধিকার হরণ করার কথা বলে না। বরং মুসলমান অমুসলিমের বাড়িতে আসা-যাওয়া করতে এবং তার থেকে বৈধ, হালাল খাবারও গ্রহণ করতে পারবে। রাসূল (সা.) নিজে অমুসলিমদের ঘরে খাবার খেয়েছেন এবং অমুসলিমকে তিনি নিজে খাইয়েছেন। হাদীসে বর্ণিত আছে, আনাস ইবনু মালিক (রা.) হতে বর্ণিত, এক ইহুদি মহিলা নবী (সা.)-এর কাছে বিষ মিশ্রিত বকরী নিয়ে এলো। সেখান থেকে কিছু অংশ তিনি খেয়েছেন।(সহীহ বুখারী, হাদীস ২৪৭৪)

অমুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে বিবাহবন্ধন

ইসলাম একমাত্র জীবনব্যবস্থা; যার বিশ্বসমাজ গড়ে তোলার মতো উদারতা ও সামর্থ্য আছে। ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে একটা বৃহৎ সমাজ গঠনের সব উপাদান ইসলামে আছে। তেমনই একটি উপাদান বিয়ে। এটি মানব জীবনের

একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। সুস্থ সুন্দর ও সুশৃঙ্খল পারিবারিক জীবনের গোড়াপত্তনে বিয়েকে আবশ্যক করেছে ইসলাম। এ কারণে বিয়ে সম্পর্কে ইসলামে রয়েছে অনেক বিধিবিধান।

আল্লাহর দেওয়া বিধানেই নারী-পুরুষ একে অপরের জন্য বৈধ হয় এবং আল্লাহর দেওয়া বিধানেই একে অপরের জন্য হারাম হয়। আল্লাহর দেওয়া বিধানের আলোকেই মুসলিমরা এ বন্ধন স্থাপন করে। কোরআন-সুন্নাহর বিধিবিধানের আলোকেই এ সম্পর্ক বৈধতা লাভ করে। কোরআনুল কারিমে এ সম্পর্কে রয়েছে সুস্পষ্ট ঘোষণা। কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'মুমিন সতীসাধ্বী নারী ও আহলে কিতাবের সতীসাধ্বী নারী তোমাদের জন্য বৈধ করা হলো।' (সুরা : মায়েদা, আয়াত : ৫)

তবে এটাও স্মরণ রাখতে হবে যে ইসলাম একটি পৃথক ধর্ম। তাই আত্মীয়তা, ঘনিষ্ঠতা ও সামাজিকতার ক্ষেত্রে ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের মধ্যে কিছু পার্থক্য ধরে রাখা হয়েছে। যেমন— আহলে কিতাবের নারীদের বিয়ে করা মুসলমানদের জন্য বৈধ বটে; কিন্তু আহলে কিতাব কোনো পুরুষের সঙ্গে মুসলিম নারীদের বিয়ে বৈধ নয়।

আহলে কিতাব ছাড়া অন্য ধর্মের অনুসারীদের সঙ্গে কোনো ধরনের বৈবাহিক সম্পর্ক বৈধ নয়। সুতরাং প্রচলিত হিন্দু, বৌদ্ধ, বাহায়ি, শিখ ও কনফুসীয় ধর্ম আসমানি ধর্ম হওয়ার বিষয়টি অকাট্যভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় এসব ধর্মের অনুসারীরা আহলে কিতাব হিসেবে গণ্য হবে না। তাই তাদের সঙ্গে মুসলিম নারী ও পুরুষের কোনো ধরনের বিয়ে বৈধ নয়। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, 'ঈমান না আনা পর্যন্ত তোমরা মুশরিক (বহু স্রষ্টায় বিশ্বাসী) নারীকে বিয়ে কোরো না, যদিও মুশরিক নারী তোমাদের মুগ্ধ করে। ঈমান না আনা পর্যন্ত তোমরা মুশরিক পুরুষের সঙ্গে (তোমাদের নারীদের) বিয়ে দিও না, যদিও মুশরিক পুরুষ তোমাদের মুগ্ধ করে। ' (সুরা : বাকারা, আয়াত : ২২১)

অন্য আয়াতে এসেছে, 'তোমরা কাফির নারীদের সঙ্গে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখ না। ' (সুরা : মুমতাহিনা, আয়াত : ১০)

মুসলিম নারীদের জন্য অন্য ধর্মাবলম্বী পুরুষকে স্বামী হিসেবে গ্রহণের কোনো সুযোগ নেই। এ প্রসঙ্গে এক আয়াতে এসেছে, 'হে মুমিনরা! যখন তোমাদের কাছে মুমিন নারীরা হিজরত করে আসে, তখন তোমরা তাদের পরীক্ষা করে নাও, তাদের ঈমান সম্পর্কে আল্লাহই ভালো জানেন। অতঃপর যদি তাদের মুমিন বলে জানতে পার, তাহলে তাদের কাফিরদের কাছে ফিরিয়ে দিও না। মুমিন নারীরা কাফিরদের জন্য হালাল নয়। আর কাফিররাও তাদের জন্য হালাল নয়। ' (সুরা : মুমতাহিনা, আয়াত : ১০)

অনেক মানুষকে বলতে শোনা যায় 'মুসলমান ছেলেদের জন্য আহলে কিতাব মহিলাদের বিবাহ করা বৈধ।' এটি একটি ব্যাখ্যাবিহীন অসম্পূর্ণ কথা। কেউ কেউ একথা শুনে মনে করেন যে, যে কোনো ইহুদী-খৃস্টান মহিলাকে বিবাহ করা বৈধ। অথচ এ ধারণা নিতান্তই ভুল।

প্রকাশ থাকে যে, এ উত্তরপত্রে তিনটি শব্দ ব্যবহৃত হবে। (১) বিবাহ 'সংগঠিত' হওয়া (২) বিবাহ 'না জায়েয' হওয়া (৩) বিবাহ 'অনুত্তম' হওয়া। এ তিনটি শব্দের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা নিম্নরূপ :

- বিবাহ 'সংগঠিত' হওয়ার অর্থ হচ্ছে, এ কাজ সম্পাদনের পর ওই দম্পতির স্বামী-স্ত্রী সুলভ সম্পর্ক ব্যভিচার বলে গণ্য হবে না এবং তাদের সন্তান বৈধ বলে গণ্য হবে।
- আর বিবাহ 'না জায়েয' হওয়ার অর্থ হচ্ছে, কাজটি করা শরীয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ ও গোনাহের কাজ এবং তা থেকে বিরত থাকা কর্তব্য।
- আর বিবাহ 'অনুত্তম' বলে বুঝানো হয়েছে কাজটি সম্পূর্ণ অবৈধ না হলেও তা পরিত্যাজ্য ও গর্হিত এবং তা থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক।

জেনে রাখা আবশ্যক যে, কোনো ইহুদী-খৃস্টান মহিলার সাথে বিবাহ শরীয়তের দৃষ্টিতে বিবাহ বলে গণ্য হওয়ার জন্য দুটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত রয়েছে। এদুটি শর্তের কোনো একটি না পাওয়া গেলে সেটি বিবাহ বলেই গণ্য হবে না; বরং যিনা ও ব্যভিচার সাব্যস্ত হবে। তবে উভয় শর্ত পাওয়া গেলেই যে তাদেরকে বিবাহ করা বিনা দ্বিধায় নিঃশর্ত জায়েয ও বৈধ হয়ে যাবে বিষয়টি এমনও নয়; বরং বিবাহের পদক্ষেপ নেওয়ার পূর্বেই আরও কয়েকটি শর্তের উপস্থিতির ব্যাপারে আশ্বস্ত হওয়া আবশ্যক। যদি ওই শর্তগুলো না পাওয়া যায় তবে সে ক্ষেত্রেও বিবাহ জায়েয হবে না। এর পরের কথা হল, এই শর্তগুলোও যথাযথ বিদ্যমান থাকলে বিবাহ তো জায়েয হয়ে যাবে, কিন্তু এ কাজ যে অবশ্যই মাকরূহ হবে তা তো বলাই বাহুল্য। ইসলামী শরীয়তে যেখানে মুসলিম নারীকে বিবাহ করার ক্ষেত্রেও নামাযী ও শরীয়তের অনুসারী নারীকে পছন্দ ও অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য বিশেষভাবে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে সেখানে যে মহিলা ইসলামের কালিমাকেই মানে না (যদিও সে আহলে কিতাব হয়ে থাকুক এবং বিবাহ সহীহ হওয়ার নির্ধারিত শর্তসমূহও বিদ্যমান থাকুক) তাকে বিবাহ করা কি আদৌ পছন্দনীয় হতে পারে? এখানে ভুল বোঝাবুঝির মূল কারণ এই যে, প্রধান দুই শর্ত সাপেক্ষে আহলে কিতাব মহিলার সঙ্গে বিবাহ শুদ্ধ হওয়াকেই জায়েয হওয়া বলে মনে করা হয়। অথচ বিবাহ শুদ্ধ হলেই জায়েয হয় না; বরং জায়েয হওয়ার জন্য ভিন্ন শর্ত রয়েছে। সেদিকে লক্ষ করা হয় না। এরপর বিবাহ জায়েয হওয়ার শর্তাবলি বিদ্যমান থাকা অবস্থায় যে বিবাহ সম্পন্ন হয়, তাকে মাকরূহ বিহীন বিবাহ ধারণা করা হয়ে থাকে; অথচ এ ধারণা সহীহ নয়। এজন্য নিম্নে আহলে কিতাব মহিলাদের বিবাহ করা সম্পর্কিত ইসলামের নির্দেশনাসমূহ তিনটি স্তরে কিছুটা বিশ্লেষণের সাথে তুলে ধরা হল। বিষয়টি যথাযথভাবে বুঝে নেওয়া আবশ্যক।

এক. বিবাহ শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলি

প্রথমেই জানা দরকার যে, এ যুগের অধিকাংশ ইহুদী ও খৃস্টান আহলে কিতাব নামধারীরা আদমশুমারীতে ওই দুই ধর্মের লোক বলে সরকারিভাবে রেজিষ্ট্রিকৃত হলেও মূলত তারা কোনো আসমানী কিতাব বা ধর্মে বিশ্বাসী নয়; বরং ঘোষিত বা অঘোষিতভাবে জড়বাদী ও বস্তুবাদী নাস্তিকই বটে। তাই কোনো নারীর শুধু সরকারী খাতায় ধর্মাবলম্বী বলে নিবন্ধিত হওয়া কিংবা ইহুদী বা খৃস্টান নামধারী হওয়াই তার সাথে মুসলমান পুরুষের বিবাহ সহীহ শুদ্ধ হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়; বরং বিবাহ শুদ্ধ হওয়ার জন্য নিুোক্ত শর্তসমূহ পূর্বে যাচাই করে নিতে হবে।

(১) মেয়েটি বস্তুবাদী নাস্তিক না হতে হবে; বরং প্রকৃত অর্থে ইহুদী বা নাসারা তথা আহলে কিতাব হতে হবে। এ জন্য তার মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর উপস্থিতি জরুরি।

(ক) আল্লাহ তাআলার সত্তা ও অস্তিত্ব স্বীকার করা।

(খ) আল্লাহ প্রেরিত যেকোনো নবী-রাসূল ও তার উপর নাযিলকৃত আসমানী কিতাবের উপর ঈমান থাকা।

(২) মেয়েটি পূর্ব থেকেই ইহুদী বা খৃস্টান ধর্মে বিশ্বাসী হতে হবে। মুরতাদ, অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে ইহুদী বা খৃস্টান হয়েছে এমন না হতে হবে। এমনিভাবে কোনো মুরতাদের ইহুদী-খৃস্টান মেয়ের সাথেও মুসলমান পূরুষের বিবাহ সংগঠিত হওয়ার সুযোগ নেই।

এসব শর্ত কোনো ইহুদী বা খৃস্টান মেয়ের মধ্যে পাওয়া গেলে শরীয়তের নিয়ম অনুযায়ী তাকে বিয়ে করলে বিবাহ শুদ্ধ বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ এ সকল শর্ত সাপেক্ষে বিবাহের আকদ করলে তাদের একত্রে থাকা ব্যভিচার হবে না; বরং তাদের মেলামেশা বৈধ ধরা হবে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, কেবল এ শর্তগুলো পাওয়া গেলেই তাদেরকে বিবাহ করা জায়েয তথা নিস্পাপ কাজ বলে গণ্য হবে; বরং সে জন্য দরকার আরও কয়েকটি শর্তের উপস্থিতি। যা পরবর্তী ধাপে বর্ণনা করা হচ্ছে। -আহকামুল কুরআন, জাস্সাস ২/৩২৩-৩২৬; তাফসীরে রূহুল মাআনী ৪/৬৪; ফাতহুল কাদীর ৩/১৩৫; আদ্দুররুল মুখতার ৩/৪৫, ৪/২৫৫-২৫৬; বাদায়েউস্ সানায়ে ৬/১২৫-১২৬; বুহুস ১/৪১৫; তাফসীরে মাজহারী ৩/৪২

দুই. বিবাহ জায়েয হওয়ার শর্তাবলি

(১) ইহুদী-খৃস্টান মেয়েকে বিবাহের আগে এই বিষয়ে প্রবল আস্থা থাকতে হবে যে, এই বিবাহে স্বামীর দ্বীন-ধর্মের কোনো ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা নেই; বরং এই বিবাহের পরও সে ঈমান ও দ্বীনের উপর অটল থাকতে পারবে ইনশাআল্লাহ।

(২) এই ব্যাপারেও নিশ্চিত ধারণা ও আস্থা থাকতে হবে যে, এই দম্পিতির যে সন্তানাদি জন্মগ্রহণ করবে (মা আহলে কিতাব হওয়ার কারণে) তাদের দ্বীন-ঈমান রক্ষার ক্ষেত্রে কোনো বাধা শিক্ষা-দীক্ষা অনুযায়ী জীবন কাটাতে পারবে। পুরুষ অথবা তার ভবিষ্যত সন্তানদের ক্ষেত্রে উক্ত বিষয়ে কোনো আশঙ্কা থাকলে বিবাহ জায়েয হবে না।

(৩) বিবাহের আগে ভালোভাবে জেনে নিতে হবে, যে রাষ্ট্রের মহিলাকে বিবাহ করার ইচ্ছা করছে সে রাষ্ট্রে সন্তানদেরকে মায়ের ধর্মের অনুসারী গণ্য করার আইন রয়েছে কি না। অর্থাৎ 'মা অমুসলিম হলে সন্তানও অমুসলিম ধর্তব্য হবে' এরকম আইন থাকলে সেখানে থেকে ওই মহিলাকে বিবাহ করা জায়েয হবে না।

(৪) তালাক বা স্বামীর ইন্তেকালের কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেলে সন্তানরা ধর্মের দিক থেকে মায়ের অনুসারী গণ্য হবে এবং স্বামী বা স্বামীর ওয়ারিশরা তাদের নিতে পারবে না-এই ধরনের কোনো আইন যে দেশে রয়েছে সে দেশে অবস্থিত কোনো আহলে কিতাব মহিলাকেও বিবাহ করা জায়েয হবে না।

(৫) যদি আলামত-প্রমাণের মাধ্যমে স্পষ্টত বোঝা যায় যে, এই বিবাহের কারণে ইসলামী রাষ্ট্র বা মুসলমানদের কোনো ক্ষতি হবে তাহলে এ বিবাহ থেকে দূরে থাকা আবশ্যক। বিধর্মী রাষ্ট্রের ইহুদী-খৃস্টানদের মধ্যে যেহেতু সাধারণত উপরোক্ত শর্তগুলো পাওয়া যায় না তাই ফুকাহায়ে কেরাম ঐক্যবদ্ধভাবে এই ফতোয়া দিয়েছেন যে, বিধর্মী রাষ্ট্রের কোনো আহলে কিতাব মহিলাকে বিবাহ করা মাকরূহে তাহরীমী; তথা না জায়েয ও গোনাহের কাজ। কোনো আহলে কিতাব মহিলা যদি ইসলামী রাষ্ট্রের অধিবাসী হয়ে থাকে এবং উপরোক্ত শর্তগুলো পরিপূর্ণভাবে পাওয়া যায় তাহলে বিবাহ যদিও সংঘটিত হয়ে যাবে কিন্তু তা হবে খুবই অনুত্তম কাজ। যার আলোচনা তৃতীয় ধাপে আসছে।

উপরোক্ত আলোচনার স্বপক্ষে কিছু নির্ভরযোগ্য দলীল প্রামাণ নিম্নে পেশ করা হল,

- তাফসীরে রুহুল মাআনীতে এসেছে,

جاء في روح المعاني ٤/٦٦ : قال ابن عباس رضي الله عنه : لَا يَحِلُّ نِكَاحُ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ، إِذَا كَانُوا حَرْبًا

প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, 'আহলে কিতাব মহিলাগণ 'হারবী' তথা কাফের রাষ্ট্রের অধিবাসিনী হলে তাদের সাথে বিবাহ বন্ধন বৈধ নয়। -তাফসীরে রুহুল মাআনী ৪/৬৬

- সুপ্রসিদ্ধ ফক্বীহ আল্লামা ইবনে হুমাম রহ. (মৃত : ৮৬১ হি.) বলেন,

وتكره كتابية الحربية إجماعا، لانفتاح باب الفتنة من إمكان التعلق المستدعي للمقام معها في دار الحرب وتعريض الولد على التخلق بأخلاق أهل الكفر.

কাফের রাষ্ট্রের আহলে কিতাব মহিলাকে বিয়ে করা ফিকাহবিদদের সর্বসম্মতিক্রমে মাকরূহে তাহরীমী (না জায়েয)। কারণ স্বামীকে কাফের রাষ্ট্রে তার সাথে বসবাস করতে হবে। ফলে সকল প্রকার ফিতনার দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যাবে এবং এতে সন্তানদেরকে কাফেরদের সমাজে তাদের মতো করে বেড়ে উঠতে বাধ্য করা হবে। -ফাতহুল কাদীর ৩/১৩৫

- সুপ্রসিদ্ধ ফকীহ আল্লামা দারদীর রহ. বলেন,

ويتأكد الكره أن تزوجها بدار الحرب، لأن لها قوة بها لم تكن بدار الإسلام فربما ربت ولده على دينها ولم تبال باطلاع أبيه على ذلك.

কাফের রাষ্ট্রের আহলে কিতাব মেয়েকে বিয়ে করা আরও কঠিনভাবে নিন্দনীয়। কারণ মুসলিম রাষ্ট্রের আহলে কিতাব মহিলার চেয়ে এদের ক্ষমতা অনেক বেশি থাকে। ফলে মহিলাটি সন্তানদেরকে স্বীয় ধর্মের উপর লালিত পালিত করতে থাকবে এবং সন্তানের পিতাকে এ ব্যাপারে সে কোনো পরওয়াই করবে না। -আশশারহুস সাগীর ১/৪০৬

- বিখ্যাত ফকীহ আল্লামা শারবীনী রহ. বলেন,

لكن تكره حربية ليست بدار الإسلام وكذا تكره ذمية على الصحيح لما مر من خوف الفتنة لكن الحربية أشد كراهة منها.

কিন্তু যে সকল আহলে কিতাব মহিলা কাফের রাষ্ট্রে থাকে তাদেরকে বিবাহ করা মাকরূহ। তদ্রƒপ বিশুদ্ধ মতানুযায়ী মুসলমান দেশে বসবাসকারিনী আহলে কিতাব মহিলাকে বিয়ে করা দোষনীয়; ফিতনার আশঙ্কার কারণে। কিন্তু মুসলিম রাষ্ট্রের চেয়ে কাফের রাষ্ট্রের অধিবাসিনীকে বিয়ে করা অধিক গর্হিত কাজ। -মুগনীল মুহতাজ ৩/১৮৭

- জামেয়া আজহারের প্রখ্যাত শায়খ আব্দুল্লাহ আল গুমারী রহ. বলেন,

ومنها ما هو أشد قبحا أن الأولاد يتنصرون حتما تبعا لأمهم النصرانية، لأن الزوج إذا مات ضمتهم الأم إليها وربتهم على دينها وإذا طلقها فلا يسمح له القانون أن يأخذ أولاده بل يبقون مع والدتهم النصرانية.

কাফের রাষ্ট্রের আহলে কিতাব মহিলাদেরকে বিয়ে করার বড় একটি খারাবী হল, সন্তানাদি মার মতোই খৃস্টান হয়ে যায়। কারণ পিতার মৃত্যু ঘটলে মা নিজের ধর্মের অনুসারী করে সন্তানদেরকে লালন করতে থাকে। আর যদি স্বামী তালাক দিয়ে দেয় তাহলে রাষ্ট্রীয় আইনে স্বামী সন্তান নিয়ে যাওয়ার অনুমতি পায় না। ফলে সন্তানরা মার সাথে থেকে তার ধর্মেই দিক্ষিত হয়।

এরপর তিনি (শায়খ আব্দুল্লাহ) বেশ কিছু বাস্তব ঘটনার উদাহরণ নিয়ে এসেছেন, যেগুলোতে দেখা গেছে যে, সন্তানরাও তাদের মায়ের ধর্মাবলম্বী হয়েই বড় হয়ে উঠেছে ও আহলে কিতাব হয়ে গেছে।

আরও দ্রষ্টব্য : আহকামুল কুরআন, জাস্সাস ২/৩২৬; আহকামুল কুরআন, থানভী ১/৪০৪; তাফসীরে মাজহারী ৩/৪১; তাতার খানিয়া ৩/৭

তিন. মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসকারিনী ইহুদী-খৃস্টানকে বিবাহের হুকুম

আহলে কিতাব নারী যদি মুসলমান রাষ্ট্রে বসবাসকারিনী হয় এবং তাদেরকে বিয়ে করলে স্বামী বা সন্তান বিধর্মী হওয়ার আশঙ্কা নাও থাকে তবুও সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন ও চার মাযহাবের ফেকাহবিদগণ ঐকমত্যের ভিত্তিতে তাদেরকে বিয়ে করা মাকরূহ বলেছেন।

أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/٢٩٦-٢٩٨ : تَزَوَّجَ حُذَيْفَةُ يَهُودِيَّةً فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنْ خَلِّ سَبِيلَهَا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنْ كَانَتْ حَرَامًا خَلَّيْتُ سَبِيلَهَا فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنِّي لَا أَزْعُمُ أَنَّهَا حَرَامٌ، وَلَكِنِّي أَخَافُ أَنْ تَعَاطَوُا الْمُومِسَاتِ مِنْهُن.

সাহাবী হুযায়ফা রা. এক ইহুদী মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন। হযরত উমর রা. পত্র মারফত ওই মেয়েকে ছেড়ে দেওয়ার পারমর্শ দিলেন। তখন তিনি লিখে পাঠালেন, যদি তাকে বিয়ে করা হারাম হয়ে থাকে তাহলে আমি ছেড়ে দিব। উত্তরে হযরত জানালেন, আমি হারাম হওয়ার কথা বলি না, তবে আমার ভয় হয় এদের মাধ্যমে ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়বে। -ইবনে আবি শাইবা ৩/২৯৬-২৯৮

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে,

وأخرج عبد الرزاق في مصنفه ٦/٧٨ : عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ حُذَيْفَةَ نَكَحَ يَهُودِيَّةً فِي زَمَنِ عُمَرَ، فَقَالَ عُمَرُ: طَلِّقْهَا فَإِنَّهَا جَمْرَة.

‘হুযায়ফা রা. হযরত উমর রা.-এর শাসন আমলে এক ইহুদী মহিলাকে বিয়ে করেন। তখন উমর রা. তাকে বললেন, ‘তুমি ওই মেয়েকে তালাক দিয়ে দাও। কারণ সে হল অগ্নিকু-।’ -মুসান্নাফু আবদির রাজ্জাক ৬/৭৮

এ ঘটনার কিছু দিন পর হযরত হুযায়ফা রা. ওই মেয়েকে তালাক দিয়ে দেন।

أخرج عبد الرزاق في مصنفه ৬/৭৯ : أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ نَكَحَ بِنْتَ عَظِيمِ الْيَهُودِ قَالَ: فَعَزَمَ عَلَيْهِ عُمَرُ إِلَّا مَا طَلَّقَهَا.

হযরত ত্বলহা রা. জনৈক ইহুদী মহিলাকে বিয়ে করলে খলিফা হযরত উমর রা. তাকে তালাক দিতে বাধ্য করেন। -মুসান্নাফু আবদির রাজ্জাক ৬/৭৯

হযরত উমর রা.-এর যুগ স্বর্ণযুগের অন্তর্ভুক্ত। তার প্রশাসনের অধীনে বসবাসকারিনী আহলে কিতাব মহিলার বিয়ের ব্যাপারে যদি তার এ অভিমত হয়ে থাকে তবে বর্তমান যুগে ইহুদী-খৃস্টান নারীদের অবস্থা দেখলে তিনি কি হুকুম দিতেন তা সহজেই অনুমেয়। হযরত হাসান রা.কে একদা আহলে কিতাব মহিলাকে বিয়ের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি এর জবাবে বলেছিলেন,

مَا لَهُ وَلِأَهْلِ الْكِتَابِ وَقَدْ أَكْثَرَ اللَّهُ الْمُسْلِمَات.

আহলে কিতাব মহিলাকে কেন বিবাহ করতে হবে? অথচ আল্লাহ তাআলা প্রচুর মুসলমান রমণী রেখেছেন। -রুহুল মাআনী ৪/৬৬

আল্লামা জাসসাস রহ. তাদের নারীকে বিয়ে করা মাকরূহ হওয়ার আরেকটি কারণও বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তাআলার ইরশাদ

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَآدُّوْنَ مَنْ حَآدَّ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَه.

অর্থ :- যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে তাদেরকে আপনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না। -সূরা আলমুজাদালাহ ২২

আর বিবাহ যে ভালোবাসা সৃষ্টি করে এটা তো বলাই বাহুল্য। -আহকামুল কুরআন, জাস্সাস ২/৩২৬

এছাড়াও চার মাযহাবের ফকীহগণ ঐকমত্যের ভিত্তিতে মুসলিম দেশে বসবাসকারিনী আহলে কিতাব মহিলাদেরকেও বিয়ে করা মাকরূহ তথা অনুত্তম বলেছেন। -আদদুররুল মুখতার ৩/৪৫; ফাতহুল কাদীর

৩/১৩২-১৩৬; আলমুগনী ৬/৫৯০; আলমুফাস্সাল ৭/১৮-১৯; আহকামুল কুরআন, জাস্সাস ২/৩২৪; আহকামুল কুরআন থানভী ১/৪০৫

কর্মক্ষেত্রে অমুসলিমের প্রতি আচরণ

ইসলামে কর্মক্ষেত্রে অমুসলিমদের সাথে সদাচরণ, ন্যায়বিচার ও সম্মান প্রদর্শনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। নবী মুহাম্মদ (সা.) এবং সাহাবায়ে কেরাম অমুসলিমদের সাথে উত্তম আচরণের অসংখ্য উদাহরণ রেখে গেছেন।আল্লাহ বলেন:

"আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না, যারা তোমাদের সাথে ধর্মে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘর-বাড়ি থেকে বের করে দেয়নি, তাদের প্রতি সদাচরণ ও ন্যায়বিচার করতে। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালোবাসেন।" (সূরা আল-মুমতাহিনা, ৬০:৮)

অমুসলিম সহকর্মীদের সাথে ভদ্র ও শিষ্টাচারপূর্ণ আচরণ করতে হবে, তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে হবে এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করতে হবে।রাসূল (সা.) অমুসলিম প্রতিবেশী ও সহকর্মীদের সাথে উত্তম আচরণ করতেন এবং তাদের কল্যাণে কাজ করতেন। তিনি বলেছেন:

"যে ব্যক্তি কোনো অমুসলিম নাগরিকের (যিম্মি) প্রতি জুলুম করবে বা তার অধিকার খর্ব করবে, কিয়ামতের দিন আমি তার বিপক্ষে সাক্ষী হব।" (মুসনাদে আহমদ)

কর্মক্ষেত্রে অমুসলিমদের সাথে সৎ ও ন্যায়সঙ্গত ব্যবসায়িক লেনদেন করা উচিত এবং তাদের প্রয়োজনে সাহায্য করা ইসলামের শিক্ষা।কর্মক্ষেত্রে অমুসলিমদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে ইসলামের সুন্দর শিক্ষা ও চরিত্র দ্বারা তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া যায়। রাসূল (সা.)-এর জীবনী এ ক্ষেত্রে সর্বোত্তম উদাহরণ।

অমুসলিমদের সাথে খাবার গ্রহণে নির্দেশনা

অন্য ধর্মাবলম্বীদের রান্না করা খাবার যেমন, মাছ, তরকারি ইত্যাদি খাওয়া জায়েজ। তবে খাবারটি কোনোভাবেই হারাম না হতে হবে।

পাশাপাশি তাতে হারাম কোনো কিছুর সংমিশ্রণ না থাকতে হবে। (তাদের কোনো উপাস্যের জন্ম উৎস্বর্গকৃত না হতে হবে।)

রাসুলুল্লাহ (সা.) অমুসলিমদের দাওয়াত গ্রহণ করেছেন। তাদের রান্নাকৃত খাবার খেয়েছেন। তাদের দেওয়া উপহারও গ্রহণ করেছেন। (বুখারি, হাদিস ২৬১৫)

আবু হুমাইদ আল-সাঈদি (রা.) বলেন, 'আমি নবী (সা.)-এর সঙ্গে তাবুক যুদ্ধ করেছি। আয়লা-র বাদশাহ নবী (সা.)-কে সাদা রঙের একটি খচ্চর এবং একটি চাদর উপহার দিয়েছেন। ' (বুখারি, হাদিস ২৯৯০)

আল-আব্বাস বিন আবদুল মোত্তালিব হুনাইনের দিন সম্পর্কে বলেন, 'রাসুল (সা.) সাদা রঙের একটি খচ্চরের উপর ছিলেন; যে খচ্চরটি ফারওয়া বিন নুফাছা আল-জুযামি তাকে উপহার দিয়েছিলেন। ' (মুসলিম, হাদিস ১৭৭৫)

আলী ইবনে আবু তালেব (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, নবী (সা.)-কে দুমাত-এর (একটি স্থান) উকাইদির (রাজা) একটি রেশমী কাপড় উপহার দিয়েছেন। তখন তিনি সেটা আলী (রা.)-কে দিয়ে বললেন 'এটাকে কেটে খিমার (নারীর অবগুণ্ঠন) বানিয়ে ফাতেমাদের দাও। ' (বুখারি, হাদিস ২৪৭২; মুসলিম, হাদিস ২০৭১)

ইমাম শারফ আন-নববী বলেন, 'এ হাদিসে কাফেরের হাদিয়া গ্রহণ বৈধ হওয়ার পক্ষে দলিল রয়েছে। ' (শারহু মুসলিম ১৪৫০)

আনাস বিন মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ইহুদি নারী (সা.)-এর কাছে একটি বিষযুক্ত ভেড়া নিয়ে আসে। তিনি সে ভেড়া থেকে খেয়েছেন। (বুখারি, হাদিস ২৪৭৪; মুসলিম, হাদিস ২১৯০)

সৌদি আরবের স্থায়ী কমিটির ফতোয়াসমগ্রে এসেছে, 'অমুসলিমরা সাধারণ উপলক্ষগুলোতে যেমন- নতুন শিশুর জন্ম ও অন্যান্য উপলক্ষে মুসলিমদের যেসব মিষ্টান্ন দেয়, সেগুলো খাওয়া জায়েজ; তবে ধর্মীয় উপলক্ষকেন্দ্রিক কোনো খাবার খাওয়া জায়েজ নয়।

নবী (সা.) থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, 'তিনি মুশরিকদের দেওয়া উপহার গ্রহণ করেছেন। ' শাইখ আবদুল আজিজ ইবনে বাজ, শাইখ আবদুল আজিজ আলে শাইখ, শাইখ বকর আবু যায়েদ। (ফাতাওয়াল লাজনাদ দায়িমা, আল-মাজমুআ আস-সানিয়া ১০৪৭০)

শাইখ বিন উছাইমিন (রহ.)-কে জিজ্ঞেস করা হয়, আমার একজন অমুসলিম প্রতিবেশী আছে। কখনও কখনও বিভিন্ন উপলক্ষে সে আমাকে খাবার ও মিষ্টান্ন পাঠায়। এ খাবার আমি খাওয়া ও আমাদের বাচ্চাদের খাওয়ানো কি জায়েজ হবে

জবাবে তিনি বলেন, 'হ্যাঁ। যদি আপনি নিরাপদ মনে করেন, তাহলে কাফেরের দেওয়া হাদিয়া খাওয়া আপনার জন্য জায়েজ। কেননা নবী (সা.)-কে যে ইহুদি নারী ভেড়া হাদিয়া দিয়েছে এবং তিনি সেটা গ্রহণ করেছেন। যে ইহুদি তাকে তার ঘরে দাওয়াত করেছে, তিনি তার দাওয়াত গ্রহণ করেছেন এবং তার খাবার খেয়েছেন।

তাই কাফেরদের উপহার ও তাদের বাসায় খেতে কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু শর্ত হচ্ছে- নিরাপত্তার নিশ্চয়তা। যদি কোনো আশংকা থাকে, তাহলে তাদের দাওয়াত গ্রহণ করা যাবে না। অনুরূপভাবে আরেকটি শর্ত হচ্ছে, খাবার ও উপহারগুলো তাদের ধর্মীয় উপলক্ষ কেন্দ্রিক না হওয়া (যেমন- পূজা ও বড়দিন পালন ইত্যাদি ধরনের কোনো উপলক্ষ)। এই ধরনের অবস্থায় উপলক্ষকেন্দ্রিক তাদের উপহার গ্রহণ জায়েজ নেই। (ফাতাওয়া নুরুন আলাদ দারব ২৪২)

অমুসলিমদের তাদের দাওয়াতে অংশগ্রহণ করলে ঈমান-আমলের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকলে অংশগ্রহণ করা জায়েজ হবে না। (আহকামুজ জিম্মাহ ১৭২৩) অনুরূপভাবে তাদের জবাইকৃত পশুর গোশত খাওয়া যাবে না। (সুরা বাকারা, আয়াত ১৭৩)

খানাপিনার দাওয়াতে মুমিন ও মুত্তাকীরা অগ্রাধিকার পাবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, মুমিন ব্যতীত অন্য কাউকে বন্ধু বানাবে না এবং তোমার খাদ্য আল্লাহভীরু লোক ছাড়া যেন অন্য কেউ না খায় (আবুদাঊদ হা/৪৮৩২; মিশকাত হা/৫০১৮; ছহীহুত তারগীব হা/৩০৩৬)। অত্র হাদীছে মুত্তাক্বী ব্যক্তিকে খাবার খাওয়ানোর কথা বললেও বাহ্যিকভাবে বুঝা যায় যে, যিনি খাবার খাওয়াবেন তাকেও মুত্তাক্বী হওয়ার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। কারণ মুত্তাক্বী ব্যক্তির বন্ধুত্ব মুত্তাক্বী ছাড়া অন্য কারো সাথে হ'তে পারে না। তবে এই নীতি অভাবীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কেননা মুসলিম হোক, অমুসলিম হোক, অভাবীদেরকে সর্বদা অগ্রাধিকার দিতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'তারা আল্লাহর ভালোবাসায় অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীকে আহার্য দান করে' (দাহর ৭৬/৮)। এ আয়াতটি প্রমাণ করে যে, কাফের- মুশরিক বন্দীদের খাবার খাওয়ানোকেও আল্লাহ প্রশংসা করেছেন। সুতরাং অমুসলিমরা অভাবী হ'লে প্রয়োজনে তাদেরকে খাওয়ানো অগ্রাধিকার পেতে পারে (মিরক্বাত ৮/৩১৪১; তোহফাতুল আহওয়াযী ৭/৬৪; আওনুল মা'বূদ ১৩/১২৩)।

অমুসলিমকে দ্বীনের দাওয়াতে আচরণ

কাউকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের জন্য জবরদস্তি বা বলপ্রয়োগ করার কোনো সুযোগ নেই। পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছেন. 'দ্বীন সম্পর্কে কোনো জবরদস্তি নেই।'

শরীয়তের সীমারেখায় থেকে সুন্দর আচরণের মাধ্যমে যেমন অমুসলিমদেরকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়, তেমনি এ আচরণটুকুও অনেক সময় দাওয়াতের ভূমিকা পালন করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এমন মহানুভব আচরণে মুগ্ধ হয়েও তো অনেকেই ইসলাম কবুল করেছেন এবং পরবর্তীতেও সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে শুরু করে যারাই ইসলামের সুন্দর আচারগুলো নিজেদের মাঝে লালন করে গেছেন, তাদের আচরণই নীরবে অমুসলমানদেরকে ইসলামের দিকে আহবান জানিয়েছে। অনেক অমুসলিম এতে যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছে এবং আশ্রয় নিয়েছে ইসলামের শীতল ছায়ায়।

অমুসলিমকে দাওয়াত দেয়ার ১০টি পদ্ধতি:

1. যার নিকট ইসলামের দাওয়াত দিতে চান নিজেকে তার সামনে আদর্শ মুসলিম হিসেবে ফুটিয়ে তোলা। একজন দাঈ সকল অবস্থায় তার আচার-ব্যবহার কথা-বার্তা, ইবাদত-বন্দেগি ইত্যাদি বিষয়ে আদর্শবান হবেন। কারণ আদর্শবান ব্যক্তিত্ব ও সুন্দর ব্যবহার মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বানের ক্ষেত্রে খুব বেশি অবদান রাখে।

2. দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে জ্ঞান, প্রজ্ঞাপূর্ণ সুন্দর ও নম্র ভাষা ব্যবহার করা এবং বিতর্কের প্রয়োজন হলে দলীল-প্রমাণ ও যৌক্তিক পদ্ধতিতে বিতর্ক করা।
3. যাকে দাওয়াত দিবেন তার চিন্তা-ভাবনা, সংশয়, মতবাদ, দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি সম্পর্কে যথাসম্ভব জানার চেষ্টা করা এবং সে আলোকে তার সাথে কথা বলা।
4. সবার আগে তার হৃদয়ে তাওহীদ-একত্ববাদ ও আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের বীজ বপন করা। মহান আল্লাহ আমাদের স্রষ্টা এবং জীবন ও মৃত্যু দাতা। ভালো কাজ করলে তিনি পরকালে আমাদেরকে পুরস্কৃত করবেন এবং খারাপ কাজের প্রতিদানে শাস্তি প্রদান করবেন।
   এছাড়াও ইসলামের অন্যান্য আকীদা ও বিশ্বাসের মৌলিক বিষয়গুলো তার হৃদয়পটে প্রথিত করা।
5. ধৈর্য ধারণ করা। সময়, শ্রম, তার অনাগ্রহ, অভদ্র আচরণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে ধৈর্যের পরিচয় দেয়া। তাড়াহুড়া ফল লাভের আশা করা ঠিক নয়। আপনার আজকের দাওয়াত হয়ত বহু দিন পর তার হৃদয়কে আলোড়িত করবে। তাই দাওয়াত অব্যহত রাখতে হবে। কোনভাবেই হতাশা অনুভব করা যাবে না। বরং দীর্ঘ মেয়াদী চিন্তা সামনে রেখে সবরের পরিচয় দেয়া জরুরি।
6. তাকে কুরআন পড়ার জন্য উৎসাহিত করা। প্রয়োজনে তাকে কুরআনের তরজমা ও তাফসীর উপহার দেয়া।
7. তার সামনে ইসলামের সৌন্দর্যময় দিকগুলো ফুটিয়ে তোলা। অন্যের ধর্ম বা মতবাদের বদনামের চেয়ে তার কাছে ইসলামের সৌন্দর্যময় দিকগুলো তুলে ধরা অধিক প্রলপ্রসূ।
8. দাওয়াতের স্বার্থে যাকে দাওয়াত দিতে চান তার সেবা ও সমস্যা সমাধানে নিজের সময়, শ্রম, মেধা ও যথাসম্ভব অর্থ খরচ করা।
9. তার জন্য ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের উপায়-উপকরণগুলো সহজলভ্য করা। যেমন কিছু ভালো বই পড়তে দেয়া বা ভালো ওয়েব সাইট, ভিডিও ক্লিপ ইত্যাদিগুলো সরবরাহ করা।

10. তার হেদায়েতের জন্য মহান আল্লাহর নিকট দুআ করা। মনে রাখতে হবে, আল্লাহই প্রকৃত হেদায়েতের মালিক।" নিশ্চয় আপনি যাকে ভালোবাসেন তাকে হিদায়াত দিতে পারবেন না, বরং আল্লাহই যাকে চান হিদায়াত দেন।" (সূরা আল-কাসাস ২৮:৫৬)

তিনি যাকে ইচ্ছা আলোকিত পথের সন্ধান দেন। আমাদের কাজ কেবল দ্বীনের দিকে আহ্বান জানানো এবং এ পথে যথাযথভাবে পরিশ্রম করা এবং ফলাফল একমাত্র আল্লাহর উপর সমর্পন করা।

ব্যবসা-বাণিজ্য বা লেনদেনের ক্ষেত্রে অমুসলিমদের সাথে আচরণ

অমুসলিমদের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য বা লেনদেন করায়ও কোন আপত্তি নাই-যদি শরিয়া বিরোধী কার্যক্রম যেমন: অবৈধ ব্যবসা, হারাম পণ্য বিক্রয়, মানুষের সাথে প্রতারণা ইত্যাদির সাথে সম্পৃক্ততা না থাকে।

তাদের সাথে ধর্মীয় দিক দিয়ে আন্তরিক ভালবাসা রাখা হারাম হলেও কিন্তু দুনিয়াবি সম্পর্ক ও লেনদেনে কোন বাধা নেই ইনশাআল্লাহ।

সমাজে যদি অমুসলিম বসবাস করে তাহলে ইসলাম তাদের সাথে শান্তিপূর্ণ বসবাস, সুসম্পর্ক, সামাজিক যোগাযাগ ইত্যাদিতে বাধা দেয় না। তারা যদি বিপদগ্রস্ত হয় মুসলিমরা তাদে সাহায্যে ছুটে যাবে, অভাবীকে ঋণ দিবে, কেউ অভুক্ত থাকলে তার খাবার ব্যবস্থা করবে, আচার-আচরণে মানবিক ও চারিত্রিক সৌন্দর্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটাবে, তাদের প্রতি কোন ধরণের জুলুম-অবিচার করবে না, তাদেরকে কথা ও কাজে কষ্ট দিবে না, প্রতিবেশী সুলভ ভদ্রতা রক্ষা করবে ইত্যাদি-যদি তারা প্রকাশ্যে মুসলিমদের সাথে শত্রুতা, যুদ্ধ ও হানাহানিতে লিপ্ত না হয়। এটাই ইসলামের শিক্ষা ও সৌন্দর্য। এই সৌন্দর্যের মাধ্যমেই যুগে যুগে ইসলাম পৃথিবীর দিকে দিকে অমুসলিমদের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছিলো।

মোটকথা ইসলামের দৃষ্টিতে অমুসলিমদের সাথে ক্রয়-বিক্রয় এবং দুনিয়াবি লেনদেন করায় শরিয়তে কোন আপত্তি নাই।

যাহোক নিম্নে অমুসলিমদের সাথে কেনাবেচা, শরিকানায় ব্যবসা, অর্থের বিনিময়ে শ্রমিক হিসেবে তাদের কাজ করা ও সাধারণ দুনিয়াবি সম্পর্ক রাখার ব্যাপারে কুরআনের আয়াত, হাদিস এবং আলেমদের উক্তি তুলে ধরা হল:

◍ আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“আল্লাহ তাআলা ক্রয়-বিক্রয় বৈধ করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন।” (সূরা বাকারা: ২৭৫)

এখানে মহান আল্লাহ ব্যবসা করার জন্য মুসলিম ও কাফির আলাদা করেন নি বরং সাধারণভাবে ব্যবসাকে বৈধতা দিয়েছেন। সুতরাং তা জায়েজ মুসলিম-অমুসলিম সবার সাথে যদি এ ক্ষেত্রে অন্য কোন হারাম বিষয় জড়িত না হয়।

◍ হাদিসে এসেছে,

عَنْ أَنَسٍ . رضى الله عنه . قَالَ وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم دِرْعَهُ بِشَعِيرٍ

আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যবের বিনিময়ে তাঁর বর্ম বন্ধক রেখেছিলেন।” সহীহ বুখারী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন) ৪০/ বন্ধক, হা/১৫৭৬]

◍ হাদিসে আরও এসেছে, আয়েশা রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

اشْتَرَى رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক ইহুদির কাছ হতে নির্দিষ্ট মেয়াদে খাদ্য শস্য খরিদ করেন এবং নিজের বর্ম তার কাছে বন্ধক রাখেন।” [সহীহ বুখারী (তাওহীদ) ৪৮/ বন্ধক (كتاب الرهن), পরিচ্ছেদ: ৪৮/২. যে ব্যক্তি নিজ বর্ম বন্ধক রাখে। হা/২৫০৯]

ইমাম নওবী এ হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন,

أجمع المسلمون على جواز معاملة أهل الذمة وغيرهم من الكفار إذا لم يتحقق تحريم ما معه لكن لا يجوز للمسلم أن يبيع أهل الحرب سلاحاً أو آلة حرب

“মুসলিমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, জিম্মি (মুসলিম দেশে মুসলিম সরকারের জিম্মা বা নিরাপত্তায় থাকা অমুসলিম) এবং অন্যান্য কাফেরের সাথে পারস্পারিক লেনদেন ও আদান-প্রদান বৈধ-যদি এর সাথে সাথে এমন কিছু না থাকে যা হারাম হওয়া সুনিশ্চিত। কিন্তু হারবি (মুসলিমদের সাথে যুদ্ধরত কাফির) এর নিকট অস্ত্র এবং যুদ্ধের সরঞ্জাম বিক্রয় করা নাজায়েজ।”

◍ হাদিসে আরও বর্ণিত হয়েছে,

جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌّ طَوِيلٌ بِغَنَمٍ يَسُوقُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْعًا أَمْ عَطِيَّةً أَوْ قَالَ أَمْ هِبَةً قَالَ لَا بَلْ بَيْعٌ فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاة

অতঃপর দীর্ঘ দেহী এলোমেলো চুল ওয়ালা এক মুশরিক এক পাল বকরী হাঁকিয়ে নিয়ে এলো। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন: বিক্রি করবে, না উপহার দিবে?

সে বলল, না, বরং বিক্রি করব।

অত:পর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার নিকট হতে একটা বকরী কিনে নিলেন।" [সহীহ বুখারী (তাওহীদ) ৫১/ হিবা ও এর ফযীলত৫,পরিচ্ছেদ: ৫১/২৮। মুশরিকদের দেয়া উপহার গ্রহণ করা। হা/১২৬১৮] হিবা ও এর ফযিলত]

◍ তাছাড়া রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবিগণ ব্যবসার উদ্দেশ্যে বছরে দু বার (শীত ও গ্রীষ্মকালে) দামেস্ক (সিরিয়া) যেতেন যা সূরা কুরাইশে উল্লেখিত হয়েছে। সেখানে তারা অবশ্যই মুসলিম-অমুসলিম সবার সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন।

❑ **অমুসলিমদের সাথে শরিকানায় ব্যবসা করা:**

কোন অমুসলিমকে বিশ্বস্ত, আমানতদার ও অভিজ্ঞ মনে হলে তার সাথে শরিকানায় ব্যবসা করায়ও কোন আপত্তি নাই-যদি শরিয়া বিরোধী কার্যক্রম যেমন: অবৈধ ব্যবসা, হারাম পণ্য বিক্রয়, মানুষের সাথে প্রতারণা ইত্যাদির সাথে সম্পৃক্ততা না থাকে।

তাদের সাথে ধর্মীয় দিক দিয়ে আন্তরিক ভালবাসা রাখা হারাম হলেও কিন্তু দুনিয়াবি সম্পর্ক ও লেনদেনে কোন বাধা নেই ইনশাআল্লাহ।

অমুসলিমদের সঙ্গে লেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্য, তাদের কাছে জিনিসপত্র ভাড়া দেওয়া বা তাদের কাছ থেকে ভাড়া নেওয়া এসব ক্ষেত্রে ইসলামে কোনো বিধিনিষেধ নেই। রাসুলুল্লাহ (স) কাফের-মুশরিকদের থেকে জিনিসপত্র কিনেছেন। আল্লাহর রাসুলের ইন্তেকালের সময়েও তার একটি বর্ম একজন ইহুদির কাছে বন্ধক ছিল। ইহুদির কাছে বর্মটি বন্ধক রেখে তিনি তার পরিবারের জন্য খাবার জোগাড় করেছিলেন।

অমুসলিমদের ঘর-বাড়ি, কল-কারখানা ও দোকানে কাজ করার বিধান

মুসলিমদের জন্য অমুসলিমদের ঘর-বাড়ি বা তাদের পরিচালিত কল-কারখানা ও দোকানে চাকুরী করাও দোষণীয় নয়। তবে শর্ত হল, কোন হারাম কাজে যুক্ত হওয়া যাবে না বা হারাম কাজে সহায়তা করা যাবে না। যেমন: মদ, শুকুরের গোস্ত, বিড়ি-সিগারেট, বাদ্যযন্ত্র, বিধর্মীদের ধর্মীয় উপকরণ, বেপর্দা নারীদের সংশ্রব, মন্দির, গির্জা, প্যাগোডা নির্মাণ বা সংস্কার ইত্যাদি।

কেননা, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে গুনাহ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে সহায়তা করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"সৎকর্ম ও আল্লাহ ভীতিতে একে অন্যের সাহায্য কর। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না।" (সূরা মায়িদা: ২)

মুসলিম ব্যক্তি অমুসলিমের কাছে দ্বীনি বিষয়াদি ছাড়া চিকিৎসা, শিল্প, কৃষি প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক বিষয়াদিতে সহযোগিতা নিতে পারবেন ইসলাম সে অনুমতি দিয়েছে। তবে এসব ক্ষেত্রে মুসলমানদের স্বনির্ভরতা ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন অত্যন্ত জরুরি। রাসুলুল্লাহ (স) নিজে বিভিন্ন সময় অমুসলিমের কাছ থেকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজ করিয়েছেন। নবিজি মক্কা থেকে যখন মদিনায় হিজরত করে যান তখন পথ দেখাবার উদ্দেশে তিনি মক্কার মুশরিক আবদুল্লাহ ইবনে আরিকতের সাহায্য নিয়েছিলেন।

◯ সৌদি আরবের স্থায়ী ফতোয়া এবং গবেষণা বিষয়ক স্থায়ী কমিটি ফতোয়া:

تجوز مشاركتهم في الأعمال التجارية المباحة إذا أمن من يشاركهم من المسلمين غشهم وتعاملهم بما حرم الله من الربا، والقمار، والغرر ونحو ذلك، ولكن ترك مشاركتهم في التجارة خير وأولى، بعداً عن موارد الريبة ومواقع التهم والظنون والخطر

"বৈধ ব্যবসায়িক কাজে কাফেরদের সাথে অংশগ্রহণ করা জায়েজ আছে মুসলিমদের মধ্যে যে অংশগ্রহণ করবে সে যদি মানুষকে ঠকানো বা নিজে প্রতারিত হওয়া অথবা আল্লাহর হারাম কৃত যে সকল কার্যক্রম রয়েছে যেমন: সুদ, জুয়া, ধোঁকা ইত্যাদি থেকে নিরাপদে থাকে। তবে সংশয়-সন্দেহ, মানুষের অভিযোগ-আপত্তি এবং বিভিন্ন ধরণের ক্ষয়-ক্ষতির আশঙ্কা থেকে দূরে থাকার স্বার্থে তাদের সাথে অংশ গ্রহণ না করাই ভালো।" (ফাতাওয়া লাজনাহ দায়েমা, পৃষ্ঠা নং ৬৫)

অমুসলিম থেকে উপহার গ্রহণ

অমুসলিমদের অনুদান বা উপহার গ্রহণ করা মৌলিকভাবে বৈধ। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অমুসলিমদের দেওয়া উপহার গ্রহণ করেছেন। আলি ইবনে আবু তালেব রা. বলেন,

إِنَّ أُكَيْدِرَ دُومَةَ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثَوْبَ حَرِيرٍ، فَأَعْطَاهُ عَلِيًّا فَقَالَ: شَقِّقْهُ خُمُرًا بَيْنَ الْفَوَاطِمِ

অর্থ : দুমাতুল জান্দাল-এর শাসক উকাইদির নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একটা রেশমি বস্ত্র উপহার দেন। তিনি তা আলি রা.-কে দিয়ে বলেন, তুমি এটা কেটে ফাতেমাদেরকে ওড়না বানিয়ে দাও। [সহিহ মুসলিম : ২০৭১]

তবে যদি অনুদান বা উপহারের মাধ্যমে অমুসলিমরা মুসলিমদের ওপর কোনো ধরনের প্রভাব বিস্তার করতে চায় কিংবা তাদের অনুদান গ্রহণ করার মাঝে মুসলিমদের ধর্মীয় ক্ষতি নিহিত থাকে, তবে তাদের অনুদান বা উপহার গ্রহণ করা যাবে না।

অতএব, প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে যদি প্রতিবেশী হিন্দুরা ভালোবাসা থেকেই মাদরাসায় অনুদান বা উপহার দিয়ে থাকে এবং এর মাধ্যমে মাদরাসার ওপর কোনো ধরনের প্রভাব বিস্তারের আশঙ্কা না থাকে, তবে তাদের অনুদান বা উপহার গ্রহণ করতে কোনো সমস্যা নেই।

বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় ইসলামের ভূমিকা

বাংলাদেশের সর্বাধিক জনগণ ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী। বাংলাদেশে মুসলিম জনসংখ্যা প্রায় ১৪৮.৬ মিলিয়ন (১৪.৮৬ কোটি), যা বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম মুসলিম জন-অধ্যুষিত দেশ (ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান এবং ভারতের পরে)। ২০২২ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী, বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৯২ শতাংশ মুসলিম। বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। আবহমানকাল থেকে বাংলা ভূখণ্ডে নানা জাতি- গোষ্ঠী ও ধর্ম মতের অনুসারীরা পারস্পরিক সুসম্পর্ক বজায় রেখে মিলেমিশে একত্রে বসবাসের মাধ্যমে সামম্প্রদায়িক বা আন্তধর্মীয় সম্প্রীতি ঐতিহ্য সংহত রেখেছে, যার যার ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করবে এটাই ইসলামের শিক্ষা। মহাবিশ্বের স্রষ্টা ও মালিক এক। তার সব সৃষ্টির মাঝে মানুষ সর্বোৎকৃষ্ট। তার এ শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি যেন নিজেদের মাঝে সাম্য, একতা, মানবতা এবং সহমর্মিতা প্রকাশের মাধ্যমে সহাবস্থানে বসবাস করেন এই শিক্ষাই তিনি মানুষকে দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন, 'তুমি বল, তোমার প্রতিপালক প্রভুর পক্ষ থেকে পূর্ণ সত্য প্রেরিত, অতএব যার ইচ্ছা সে ঈমান আনুক, আর যার ইচ্ছা সে অস্বীকার করুক।

বাংলাদেশে যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ইসলাম ধর্মের অনুসারি তাই তাদের দায়িত্বও অনেক বেশি। পৃথিবীতে যেখানে সংখ্যাগুরুদের দ্বারা সংখ্যালঘুরা নির্যাতনের শিকার হচ্ছে সেখানে বাংলাদেশ বিশ্ববাসীর জন্য বাংলা প্রতিশব্দ হতে পারে। মানবতার কবি কাজী নজরুল ইসলাম লিখেছেন, 'গাহি সাম্যের গান/যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা ব্যবধান, যেখানে মিশেছে হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলিম, খ্রিস্টান।

বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারকগণ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন। এ দেশে ইসলাম প্রচারে সূফীদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। সূফীগণ শান্তির ধর্ম ইসলাম প্রচারের মাধ্যমে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা

করে গেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, 'সব মানুষ ছিল একই জাতিভুক্ত। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা পয়গম্বর পাঠালেন সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে'। অমুসলিমদের জান-মাল-ইজ্জত সংরক্ষণের ব্যাপারে রাসূল (সা.) কঠোর সতর্কবাণী দিয়ে বলেন, 'যে ব্যক্তি কোনো চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমকে হত্যা করলো, সে জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না। অথচ চল্লিশ বছরের দূরত্বে থেকেও জান্নাতের সুঘ্রাণ পাওয়া যায়'। একবার একজন সাহাবি রাসূল (সা.) কে জিজ্ঞাসা করলেন 'আসাবিয়্যাত' (সাম্প্রদায়িকতা) কী? জবাবে রাসূল (সা.) বলেন, 'অন্যায় কাজে স্বগোত্র-স্বজাতির পক্ষে দাঁড়ানো'। ইসলাম অন্যায় কাজকে কখনো সমর্থন করে না এবং সকল সম্প্রদায়ের মানুষ মুসলিমগণের কাছে নিরাপদ।বাংলাদেশে বহু জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র ও ভাষাভাষীর মানুষের বসবাস। বসবাসরত এসব সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যকার ঐক্য, সংহতি ও সহযোগিতার মনোভাবই হলো সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। সবার আন্তরিক প্রচেষ্টায় দেশ ও জাতি উন্নতির শিখরে আরোহণ করে। ইসলাম শান্তি ও কল্যাণের ধর্ম। এটি এমন এক সর্বজনীন ও শান্তিময় জীবনব্যবস্থা যেখানে মানব সমাজের সবারই অধিকার বিধৃত হয়েছে।

পরিসমাপ্তি

দেশ, জাতি ও ভৌগোলিক সীমারেখার উর্ধ্বে ইসলামের পরিধি। সব মানুষই এক আল্লাহর সৃষ্টি। তাই সৃষ্টিগতভাবে সমগ্র মানবগোষ্ঠী বিশ্বভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ। এ ভ্রাতৃত্ব বিশ্বমানবতার শেকড়ের সাথে সম্পৃক্ত। ইসলাম অমুসলিমদেও শুধু ধর্মীয় স্বাধীনতাই দেয়নি, তাদের সঙ্গে সামাজিক অংশীদারিত্ব, সৌজন্যবোধ, মেলামেশা ও লেনদেনের সুযোগ দিয়েছে। ইসলাম শান্তির উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে এসেছে। বর্তমান পৃথিবীতে ১.৮ বিলিয়ন মুসলিমের বসবাস। এই পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য মুসলিমগণেরই দায়িত্ব নিতে হবে। মুসলিমগণ যদি ইসলামের মহান আদর্শে উজ্জীবিত হয় পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে শান্তির সুবাতাস পৌঁছে যাবে। সাংবিধানিকভাবে বাংলাদেশে সকল সম্প্রদায়ের মানুষের স্বাধীনভাবে বসবাস করার অধিকার রয়েছে। বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় সরকার খুবই আন্তরিক। কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া আবহমানকাল থেকেই এই জনপদের মানুষ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে বিশ্বাসী। এখানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠানে একেঅপরের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় হয়। বিশ্বশান্তি ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠায় ইসলামের সুমহান বাণীর অনুশীলনই পারে সকল মানুষকে একই বন্ধনে আবদ্ধ করতে।

গ্রন্থপঞ্জি

1. আল কুরআনুল কারিম
2. সহিহ আল-বুখারি
3. সহিহ আল-মুসলিম
4. সুনানে আবু-দাউদ
5. সুনানে নাসাঈ
6. সুনানে ইবনে মাজাহ
7. জামেউত তিরমিযি
8. প্রথম আলো ৪এপ্রিল ২০২৫
9. উইকিপিডিয়া
10. কিতাবুল আদব
11. মাসিক আল কাউসার
12. যুগান্তর ২৭ডিসেম্বর ২০২৪
13. কালের কণ্ঠে ১১আগষ্ট ২০২৪
14. ঢাকা পোস্ট,১৯ অক্টোবর ২০২১,
15. Rtv news ১৩ আগষ্ট ২০২২
16. ফাতাওয়া বোর্ড , মাসিক আল ইখলাস
17. Banglanews24.com ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৪
18. মাসিক আত- তাহরীক
19. অমুসলিমদের অধিকার সংরক্ষণে ইসলাম,০৪ মার্চ, ২০২৩,শায়খ আহমাদুল্লাহ
20. জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ প্রাথমিক প্রতিবেদন, ঢাকা:
21. The Daily Ittefaq ০৬ নভেম্বর ২০২০
22. আহকামুল কুরআন : আল্লামা আবু বকর আহমাদ আল-জাসসাস (রহঃ)
23. তাফসীরে রূহুল মাআনী ;
24. ফাতহুল কাদীর ,
25. আদ্দুররুল মুখতার ,
26. তাফসীরে মাজহারী